পূজাবার্ষিকী ১৪২৮

এডমন্টন বঙ্গীয় পরিষদ

ANNUAL MAGAZINE 2021

EDMONTON BENGALI ASSOCIATION

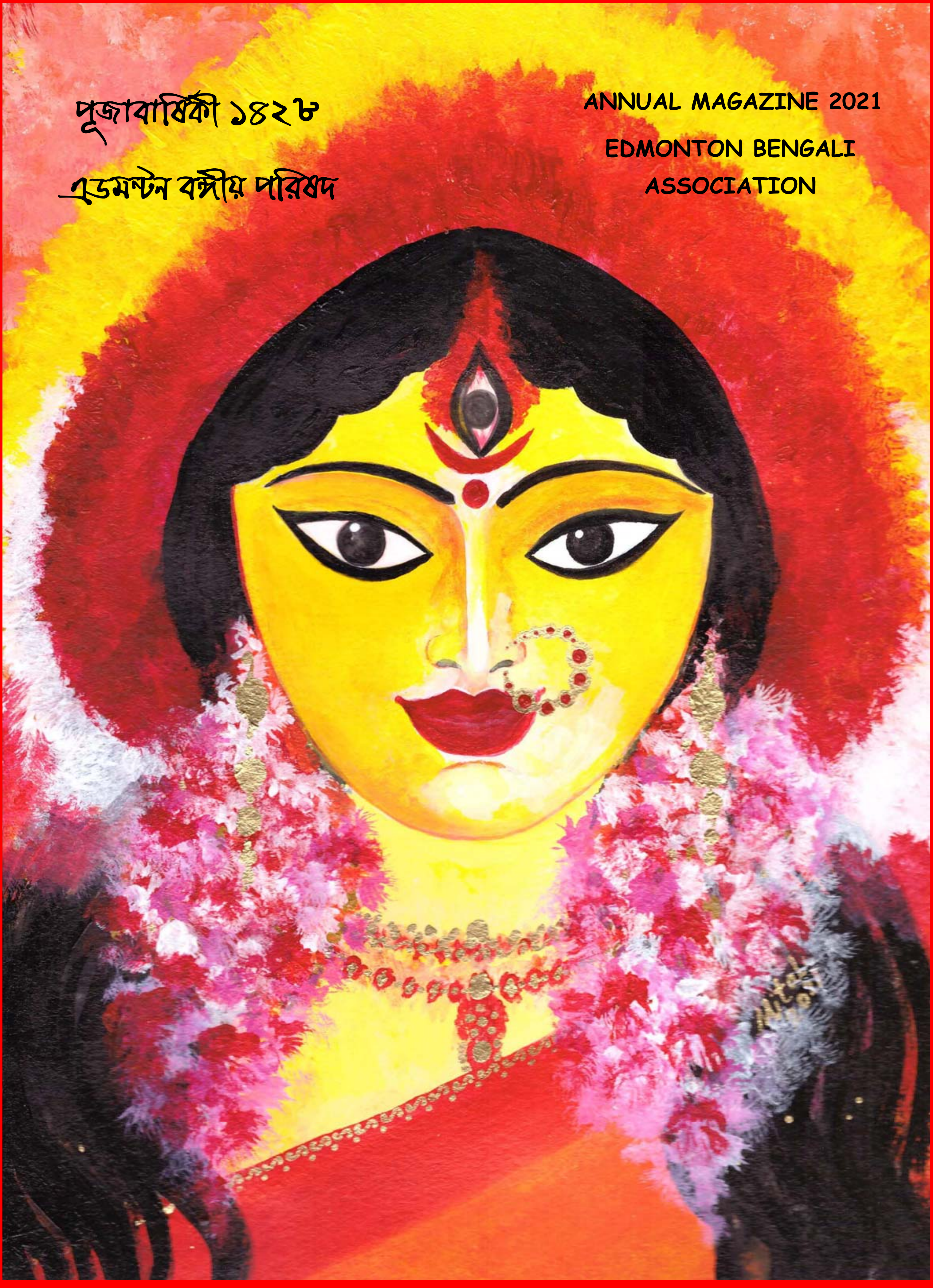

INJURED IN AN ACCIDENT?

DIAMOND & DIAMOND™ LLP LAWYERS

ASK OUR TEAM WHAT YOUR CLAIM IS WORTH

CANADA WIDE HELP LINE AVAILIBLE 24 HOURS A DAY!

OVER 50 LAWYERS ACROSS CANADA

1-800-567-HURT™

THERE'S NOTHING TOUGHER THAN A DIAMOND!

শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও অভিনন্দন

MANASH DATTA, SANJOY MUKHOPADHYAYA, SUMIT BANERJEE,

SURANJANA SENGUPTA ANNADURAI, DEBOLINA DEBNATH, SANGHAMITRA DUTTA-MCCORMACK

Edmonton Bengali Association

Executive Committee 2021-2022

TABLE OF CONTENTS

Cover Page :	*By*
Painting	Mitali Banerjee
Messages :	
Premier of Alberta	
Mayor of Edmonton	
President of Edmonton Bengali Association	Sanjoiy Mukhopadhyaya
Acknowledgement & Disclaimer	EBA
Greetings from EBA Executives	EBA
Editorial	Somnath Basu
Articles, Poems, Paintings:	
৩০ শে সেপ্টেম্বর	Nandini Raha
অভিমান [শেষ পর্ব]	Jhumu Lall
আবাসিক স্কুল – অন্য রূপে	Manash Datta
কি হবে?	Aparna (Itu) Sengupta
সময় ঘন্টা	Rita Bose
Wonders of the night sky	Snigdha Banerjee
মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩ – ১৯৫৬)	Debasis Bandopadhyaya
থিমের বাহার	Sukdeb Chattyopadhyaya
ঢেউ	Sudipta Chakraborty
রক্ত ঋণ	Safique Ahmed
Early high school shenanigans	Devaanshu Kundu
Autumn	Nishant Das Choudhury
Art Work	Camelia Bhattacharya
Art Work	Aaditya Kumar
Art Work	Neelabh Das Choudhury
Art Work	Siddharth Annadurai
Art Work	Srishti Banerjee
Art Work	Akashnil Majumdar
Miscellaneous:	
Advertisements	
EBA Member List	Compiled By: EBA Executives
Donor's Pages	List Provided By: EBA Executives

Messages...

শুভেচ্ছা বার্তা –

MESSAGE FROM THE PREMIER OF ALBERTA

On behalf of the Government of Alberta, it is my pleasure to send greetings to the members of the Edmonton Bengali Association (EBA) as you celebrate Durga Puja.

As Alberta continues to recover, it is exciting to be able to return to the gatherings that help preserve our traditions and keep us connected in community. This important and highly anticipated festival, which brings joy and blessing to Bengali people around the world, is a wonderful part of our province's diversity. I hope everyone enjoys this opportunity to worship together and commemorate the victory of good over evil.

I appreciate the EBA's 38-year history of Durga Puja celebrations, and your commitment to fostering—and sharing—Bengali culture and heritage. Thank you for being part of Alberta's story.

Best wishes for health, happiness and prosperity to each of you. Happy Durga Puja!

Hon Jason Kenney, Premier of Alberta

Message from His Worship Mayor Don Iveson

On behalf of City Council and the people of Edmonton, welcome to the 2021 Durga Puja festival.

While the past year and half have been challenging, it’s always nice to see our community members continue to celebrate their culture and traditions. Our diversity is our strength, and the more we celebrate our differences the more we can better learn from and understand each other.

I thank the Edmonton Bengali Association for continuing to organize this annual event, even in the midst of a global pandemic. It’s more important now than ever before we continue to connect with one another. Your efforts ensure your rich history continues to be an integral piece of our community and helps keep Edmonton a vibrant and welcoming city.

Yours truly,

Don Iveson
Mayor

TAMARACK DENTAL

DENTIST

Smiles on 34th

TAMARACKDENTAL.CA

587-463-1717

SMILESON34TH.CA

780-461-3434

Checkups & Cleanings

Cosmetic Dentistry

Crowns & bridges

Dentures

Extractions

Invisalign

Pediatric Services

Preventative Services

Root Canal Therapy

Veneers

Whitening

Edmonton Bengali Association

4141 – 98 Street NW, Edmonton, Alberta
Canada T6E 5N5, Phone : 780-433-7244
Email : ebaedm@gmail.com, https://myeba.ca/

Corporate Access Number: 502184518

Executive Committee
2021 - 2022

President:
Sanjoy Mukhopadhyaya
Sanjoy_mukh@hotmail.com
780-966-3958

Vice-President:
Manash Datta
manash.datta@gmail.com
780-718-6574

General Secretary:
Debolina Debnath
Debnath.debolina@gmail.com
780-918-2719

Treasurer:
Suranjana Sengupta Annadurai
suranjana71@gmail.com
587-523-1933

Cultural Secretary:
Sanghamitra Dutta-McCormack
sanghamitra23dutta@gmail.com
780-655-2411

Sports Secretary:
Sumit Banerjee
banerjeeksumit@gmail.com
587-708-9294

Youth Affairs Secretary:

Ex-Officio:
Manas Shome
mshome@telus.net
587-337-9433

Dear respected members and friends,

It's my privilege and honour to serve you as the President of Edmonton Bengali Association in its 43rd year of functioning. It reminds me of the tireless efforts and self-less services rendered by our senior members to keep our association running efficiently for the last 42 years. I truly appreciate their services and supports. As a result, today our association is one of the most vibrant socio-cultural organizations in Edmonton.

On behalf of the Executive Committee, I would like to extend my warm wishes and sincere greetings to all of you on the auspicious occasion of the Durga Puja. We celebrate this festival to characterize the victory of good over the evil. It's an occasion when all the community members gather together in good spirit, harmony and peace. But this year the unprecedented pandemic situation is affecting our lives so badly that we can't enjoy our normal lives. In this situation, it has become increasingly difficult for us to organize our annual Durga Puja. To keep it in our mind about the "Health & Safety" of our members, we will organize the puja where gathering will be fully restricted as per Alberta Health Services guidelines. In any case we will live stream our puja and cultural programs for our members and friends who can't attend the Puja.

This year we had organized Naba Barsha and Rabindra Najrul Cultural Programs virtually through You Tube and have been posted in Face Book and Instagram and there were lots of appreciations all over world. Since the programs were presented virtually we managed to connect the overseas performers with our local ones. We thank all the performers for their participation.

We extend our sincere thanks to the office of the Premier and the Mayor of the City of Edmonton for their greetings and best wishes. We also thank Alberta Gaming & Liquor Commission (AGLC) for their continuing support to our association. We are thankful to our members for their donations and to the local business communities for extending their supports by providing advertisements in our magazine.

We thank all the members of the Editorial Board for their hard work and continuing support to publish such a beautiful magazine. We also thank all the members who have enriched our annual magazine by literally contributing through their poems, stories or paintings.

This year we are deeply saddened for the loss of Dr. Rajat Maitra, one of our long time members of our association. We express our deepest condolence and sympathy to his family. Many of our members and friends lost their loved ones due to COVID and other illnesses. We express our deepest condolence to them and their families.

It's really a great privilege and pride for us to serve you in the Executive Committee. We now expect our younger generation to come forward and take the leadership role to serve you all.

With best wishes and warm regards,

Sanjoy Mukhopadhyaya

President, Edmonton Bengali Association

সম্পাদকীয়

শারদ শুভেচ্ছা। পুজো এসে গেল। আবার। অনেক ঘটনা অনেক অঘটনের মধ্য দিয়ে পুজো এসেই গেল। অবশ্য এই পুজোর সঙ্গে প্রাক-কোভিড যুগের পুজোর তফাত আকাশ-পাতাল। একটা সময় ছিল যখন পুজো এলে আমরা জনসমাগম কে উৎসাহিত করতাম, সব বাধা বন্ধন কিছুদিন এর জন্য ভুলে যেতাম। কিন্তু এখন ছবিটা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এখন আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য।

গতবার পুজোয় সম্পাদকীয় লেখার সময় উল্লেখ করেছিলাম অনেক পরিচিত মানুষ কে হারানোর কথা। কিন্তু তখনও জানতাম না যন্ত্রণার আরও বাকি আছে। নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখ, ২০২০ আমরা হারালাম বাঙালির চিরকালীন অপু- সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কে। এবারের সম্পাদকীয় লিখতে বসে তাঁর কথাই খুব বেশী করে মনে পড়ছে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়- তিনি শুধু অভিনেতা অথবা কবি বা নাট্যকর্মী নন- তিনি বাঙালির প্রতিনিধি বাকি বিশ্বের কাছে। সুদর্শন নায়কোচিত চেহারার সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব – এরকম icon বাঙালি আর কতই বা পেয়েছে? সত্যজিৎ রায় এর মত বিশ্বমানের স্রষ্টার সৃষ্টি কে সঠিক রূপ দেওয়ার পিছনে তাঁর অবদান আকাশ ছোঁয়া – সর্বার্থে তাঁরা একে অপরের পরিপূরক। শুধু অপু নয়, তিনি ময়ূরবাহন, তিনি নরসিং ,তিনি অমল, তিনি ক্ষীদ্দা, সর্বোপরি তিনি ফেলুদা। তাঁর অভিনীত একেকটি চরিত্র যেন তাঁর কর্মজীবনের একেকটি রত্নখচিত মণি। তিনি সেই নায়ক, বাঙালির যাকে পাশের বাড়ির ছেলে বলে চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয় না। তিনি শুধু পর্দার নায়ক নন যিনি শুধু চিত্রনাট্যের ভাষায় কথা বলেন, তিনি সেই নায়ক যাঁর যে কোনো সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং সুচিন্তিত মতামত আছে। এবং প্রয়োজনমত সেই মত ব্যক্ত করতে তাঁর এতটুকু গলা কাঁপেনা। তিনি সেই দুর্লভ প্রজাতির শিল্পী যিনি প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে মুখ খুলতে দ্বিধা করেননি কখনো। অসম্ভব বাস্তববাদী একজন মানুষ যিনি তাঁর প্রতিভা এবং কাজ এর মধ্য দিয়েই পরিচিত হতে চেয়েছেন সারাজীবন। তিনি সেই বিরল ব্যক্তিত্ব যিনি সিনেমার রঙিন জগৎ আর বাস্তব পৃথিবীর মধ্যে সেতু তৈরি করেছিলেন। বাংলা সংস্কৃতির জগৎ কি অপরিসীম সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর দ্বারা সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সেই সৌমিত্র আজ অতীত। তিনি নেই, না থেকেও বিপুলভাবে আছেন। তাঁর চলে যাওয়ায় তাঁর অমরত্বই প্রতিষ্ঠিত হল। তাও আমাদের বেদনা রাখার জায়গা নেই, প্রকাশ করার মত যথেষ্ট ভাষাও নেই ...ভাল থাকুন তিনি, শান্তি তে থাকুন ......

নমস্কারান্তে...

সোমনাথ বসু

পত্রিকা সম্পাদনায়-

সোমনাথ বসু, নন্দিনী রাহা, মানস দত্ত, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

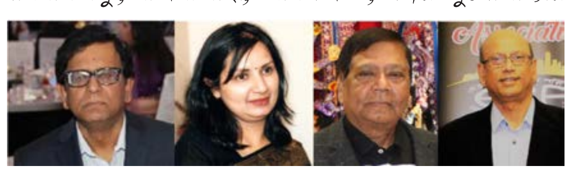

গল্প, প্রবন্ধ , কবিতা, চিত্রাঙ্কন -

Articles, Short Stories, Poems, Paintings

"৩০ শে সেপ্টেম্বর"

-নন্দিনী রাহা

সেপ্টেম্বর তিরিশ-
সত্যতাকে সামনে রেখে
এগিয়ে চলার প্রতিশ্রুতি!

একশো কুড়ি বছরেরও বেশি
সময়টা বড় কম নয়-
কত শত শৈশব চাপা পড়ে গেল
হয়ে গেল জীবনের ইতি।

আজ মাটি খুঁড়ে তাদের সামনে আনা
যারা উত্তরজীবী, তারা ঠিক জানে
দেহ গুলো রয়ে গেছে কোথায়!

কত নীরব আর্তনাদ
ভাষাহীন কান্না
কেউ শোনে নি, কেউ বোঝে নি-
রয়ে গেছে মাটির তলায়!

শুধু তারা চেয়েছিল-
একটু ভালবাসা আর খেলবার সাথী
নিজের ভাষায় কথা বলা আর সংস্কৃতি।

পরিবর্তে এল কড়া শাসন আর কদুক্তি
আদৌ কি পাওয়া যাবে এর থেকে মুক্তি?

এই লেখা রয়ে গেল, এ দেশের ইতিহাসে
যদি হও নাগরিক, ইতিহাস পড়ে
খুঁজে নিও সত্যতা, দিও নিজস্ব যুক্তি!

তুমি শক্তিমান মানেই
অন্যের বিলুপ্তি নয়-
একসাথে হোক্ পথ চলা, আসুক প্রগতি।

এই সেপ্টেম্বর তিরিশে
পরো কিছু কমলা
ভেবে দেখো, এই ছুটির মানে-

প্রতিটি শিশুই নিষ্পাপ
তাদেরও মূল্য আছে-
আছে আশা, আছে স্বপ্ন,
ছোট্ট এ প্রাণে।

এ দেশের সেই লজ্জার ইতিহাস কে মুছতে হলে
চাই চন্দনের শীতল প্রলেপ
কর্তব্য সবার- তোমার, আমার-
হাতে হাত মিলিয়ে
নিই চলো আশার পদক্ষেপ।।

অভিমান [শেষ পর্ব]

ঝুমু ব্যানার্জী লাল

পূজাবার্ষিকী ২০২০ তে যেখানে শেষ হয়েছিল, তার পর থেকে -

সে রাত্রে তন্ময় ফোন করেছিলো সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার সুদূর আমেরিকা থেকে। বহুবছর বাদে মা-বাবার সাথে কথা বলে তার এতো দিনকার বুকভরা সব অভিমান একমুহূর্তে উধাও। কখন দুইচোখ দিয়ে অশ্রু বিন্দু বিন্দু হয়ে পড়তে লাগলো সে নিজেও টের পেলো না । শক্ত করে তন্ময়কে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলো তানিয়া, গত পাঁচ বছর ওদের পরিচয় ও ভালোবাসা। একমাত্র তানিয়ার কাছেই নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে খুলে ধরতে পেরেছে তন্ময়। যে প্রশ্ন সুমিতা, সুজিত ও পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে এতগুলো বছর ব্যাকুল করেছে তার উত্তর একমাত্র জানে তন্ময়, হ্যারি আর এখন তানিয়া।

তানিয়াও একসময় তন্ময়ের মতন সেই একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল পার্থক্য শুধু ও ছিল আমেরিকাতে, তাই ওর সমাধানের পদ্ধতিও ছিল একেবারেই অন্যরকম। তানিয়া কিছুটা হয়তো বুঝেছিল তন্ময় কেন সেদিন এরকম অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। তাদের দুজনার একের ওপরের এতো নিকট হওয়ার অন্যতম না হলেও এটি একটি বিশেষ কারণ।

সেদিনের পর প্রায় প্রতি সপ্তাহে তন্ময় তার মা - বাবার সাথে কথা বলেছে কিন্তু আশ্চর্য হলো ওনারা ভুল করেও সেই অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নটি একবারও করলেন না। আজ আর কোনো দ্বিধা নেই , তন্ময় এবার মানসিক ভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত সুমিতা ও সুজিতের মুখোমুখি দাঁড়াতে। বহু চিন্তা ভাবনা করে তন্ময় ঠিক করলো একমাস বাদে সে ফিরবে দিল্লিতে। অনেক কথা, মান-অভিমান ও হাসি-কান্না দুই পক্ষের হৃদয়ের অন্দরে জমা হয়ে আছে। দুপক্ষেরই সব কথা বলতেও হবে আর মেনেও নিতে হবে নইলে আগামী দিন গুলো আনন্দময় হবে কেমন করে?

নির্ধারিত সময়ে নিউ ইয়র্ক থেকে রওনা দিলো তন্ময় দিল্লির পথে। তানিয়া বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে সব ভালো যার শেষ ভালো – "আজ তুমি নিজের চেষ্টায় কারুর সাহায্য ছাড়া নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছ ওনারা নিশ্চই সেটা বুঝবেন"। বুকভরা আশা ও আশংকা নিয়ে ঘুম আসবে না জেনেও তন্ময় লম্বা হয়ে সিটে শুয়ে পড়লো।

লম্বা সফর, না চাইলেও অশান্ত মন বার বার ফিরে যাচ্ছিলো দশ বছরেরও বেশি ফেলে আশা সেই দিনগুলোতে। ওর জীবন আরো দশটা সম্ভ্রান্ত বাড়ির বাচ্চাদের থেকে একটুও আলাদা ছিল না। যত না বাড়িতে লোক তার চেয়ে বেশি কাজের লোক। মা-বাবা দুজনই কাজ নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত থাকতেন, হাসপাতাল চালানো

সোজা কাজ তো আর নয়, তার মধ্যেই যেটুকু সময় পেতেন চেষ্টা করতেন তন্ময়ের ইচ্ছে পূরণ করতে। কত রাত ঘুম ভেঙে উঠে মা-বাবা কে কাছে পেতে চেয়েছে কিন্তু কখনো মা, কখনো বাবা আবার কখনো দুজনকেই সে বাড়িতে পায়নি। সেদিনই হয়তো কোনো ইমার্জেন্সি দরকারে হাসপাতালে। কাজের লোকেরা যথেষ্ট দেখাশুনা করেছে, তবুও সেই বাচ্চার অবুঝ মন একটু একটু করে বহুদিন, বহুবার অভিমানে , দুঃখে জর্জরিত হয়েছে। সুমিতা বা সুজিতের কাজের চাপ তখন এতই বেশি যে তার সেই অভিমান ভাঙাবার সময়টুকুও তাঁদের ছিলোনা।

তন্ময় জানতো বাড়ির প্রথা অনুযায়ী তাকেও একদিন এই পেশাকেই করতে হবে তার রোজগারের মূল অবলম্বন। অসাধারণ মেধাবী ও স্বাবলম্বী ছিলো তন্ময়। প্রতিনিয়ত তার আত্মবিশ্বাস যতো বেড়েছে ততই সে অন্তর থেকে অনুভব করেছে ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে তার একেবারেই নেই।

এই প্রজন্মের কিছু বাচ্চার নিজস্ব কিছু স্বপ্ন থাকে তার চেয়েও শতগুণ বেশি স্বপ্ন, ইচ্ছে,ও চাহিদা থাকে তাঁদের মা বাবার। সেখানেই শুরু হয় দুই বিপরীত ভাবনার মধ্যে এক অপরিসীম দ্বন্দ্ব। কখনো খুব সহজে কথার বিনিময়ে সেই দ্বন্দ্বের আপোষ হয় আবার কখনো দূরত্ব এতো বেড়ে যায় যে তাঁরা সে বিষয় নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন অনুভব করেন না। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো যখনই সুমিতা বা সুজিত এর সাথে আলোচনা করতে চেয়েছে, প্রতিবারই সে শুনেছে তার এই উদ্ভট বিলাসিতার কোনো জায়গা নেই তাঁদের বাড়িতে। তন্ময় জানতো এই ব্যাপারে সে বাড়ির অন্য সদস্যেদেরও কারুর কোনো সাহায্য পাবে না। তাঁদের দোষও দেওয়া যায়না - দুই বাড়ির-ই ছেলে মেয়েরা নিজেদের সময় মতন ডাক্তারি পড়ছে বা পড়া শেষ করে এখন হাসপাতালের সাথে যুক্ত। নিজের মতন করে হয়তো তারা সবাই ভালোই আছে। তাহলে তন্ময়ের মনে কেন এতো দ্বিধা ? দিনে দিনে তার অস্থিরতা আরো বেড়েছে। প্রায়ই মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে, সারা রাত ছটপট করেছে। সব শেষে অনেক ভাবনা চিন্তা করে সংকল্প করলো তার ইচ্ছেপূরণ সে নিজেই করবে , বাড়ির কারুর সাহায্যের তার প্রয়োজন নেই। ডাক্তারি পড়া তার লক্ষ্য নয়।

একটি সুপরিচিত প্রবচন আছে - সমস্ত অন্তর থেকে জীবনে কিছু চাইলে, সেটা পেতে ঠাকুরও সাহায্য করেন সর্বরকম ভাবে। জানা থাকেনা শুধু কখন ও কেমন করে সেটা হবে । একদিন রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে টেবিলে রাখা নিজের নামের চিঠির খাম গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে একটি খাম বিশেষ ভাবে ওকে আকৃষ্ট করলো। রিটার্নিং এড্রেস আমেরিকান হাই কমিশন দিল্লী - অন্যমনস্ক ভাবেই খামটা খুললো। আমেরিকান এমব্যাসি ওকে ওই চিঠিতে জানিয়েছে ওর আঠেরোতম জন্মদিনে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন দেশের নাগরিকত্ব সে রাখতে চায় - ওর জন্মভূমি আমেরিকা নাকি ওর বর্তমান বাসস্থান ভারত? কিছুক্ষন পাথরের মতন স্থির হয়ে বসে রইলো। অবশেষে যখন উঠে দাঁড়ালো ওর মাথাটা একেবারে পরিষ্কার, সেদিন সে পেলো তার প্রকৃত পথের সন্ধান। ঠাকুরের আশীর্বাদ ও নির্দেশ মনে করে এগিয়ে যাবে। ভয় বা পিছুটানের কোনো জায়গা নেই তার এই সিদ্ধান্তে।

তন্ময়ের স্কুলের বেশিরভাগ বন্ধুরা ছিল পাঞ্জাবি। তাদের মধ্যে অনেকেরই ভারতের বাইরে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছা। তারা যেতে চায় পৃথিবীর নানা প্রান্তে - UK , Australia, Canada ও USA - তাদের আত্মীয় স্বজনরাও ছিলেন বিভিন্ন দেশের নাগরিক। তাদের মা-বাবারা সন্তান কে দূর দেশে একলা পাঠাতে এতটুকু দ্বিধা করতেন না। সেরকম বাড়ির-ই ছেলে ছিলো তন্ময়ের প্রিয় বন্ধু হরজিৎ সিংহ ওরফে হ্যারি যার নিউ ইয়র্ক যাওয়া নির্ধারিত হয়ে গেছে। হ্যারি ওখানে ওর কাকার কাছে থাকবে।

পরদিন সকালে ইন্ডিয়ান হাই কমিশন অফিসে গিয়ে জানালো সে মার্কিন নাগরিকত্ব-ই নিতে চায় ঠিক ছয় মাস বাদে ওর ১৮ তম জন্মদিনে। তন্ময় অবাক হয়ে দেখল তাঁরা ওকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের মর্যাদা দিয়ে প্রতিটি নিয়ম, পলিসি ও প্রিভিলেজ বোঝালেন। ৬ মাস অনেক সময় -ওকে তার মধ্যে নিজেকে যেমন সবরকম ভাবে তৈরি করতে হবে তেমনি খেয়ালও রাখতে হবে বাড়ির কেউ ঘুনাক্ষরেও যেন জানতে না পারে। সেই সময় প্রতি পদক্ষেপে ওকে সাহায্য করেছে হ্যারি। হ্যারি সেদিন নিজের বাড়িতেও সব গোপন করেছিলো , ভবিষ্যতে যাতে তাঁদের কোনো জবাবদিহি করতে না হয়।

মেডিকেল এন্ট্রান্স ও অন্যান্য সব পরীক্ষাতেই সে ৯৬% এর ওপরে নম্বর পেলো। তন্ময়ের অসম্ভব আত্মবিশ্বাস। অনিচ্ছা নিয়ে ডাক্তার হওয়ার চেয়ে নিজের মেধা, বুদ্ধি ও পছন্দসই জীবিকা নিয়ে এগিয়ে গেলে ভবিষ্যতে সে সাফল্য তো পাবেই তার চেয়েও পাবে মানসিক শান্তি -সেটাও সেই অল্পবয়সেই বুঝেছিলো।

প্রয়োজনীয় টাকা জোগাড় করতে খুব একটা অসুবিধা হলো না তন্ময়ের। একটা ভালো অ্যামাউন্ট ওর একাউন্ট এ প্রতিমাসে জমা পড়তো। সুজিত বলেছিলেন ওর পছন্দ মতন মেডিকেল কলেজ এ অ্যাপ্লিকেশান পাঠাতে যে টাকা লাগবে সেখান থেকে তুলে নিতে। খুব সুবিধে হলো তন্ময়ের। একটি মাত্র অ্যাপ্লিকেশান পাঠালো বোম্বেতে। তাছাড়া নিজের বেশ কিছু ব্যক্তিগত জিনিস বিক্রি করে ওর প্লেন ভাড়া ও কয়েক মাসের হাত খরচ জোগাড় করতে খুব অসুবিধা হলো না । প্রথমে হ্যারির কাকার বাড়ি নিউজার্সি তে উঠবে তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। হ্যারিও অসম্ভব খুশি, বিদেশে কাকা থাকলেও তন্ময়ের মতন বন্ধু পাশে থাকলে ওর অনেক সুবিধে হবে।

নির্ধারিত দিনে ডোমেস্টিক গেটে সুমিতা ও সুজিত কে বিদায় দিয়ে সোজা চলে গেলো ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ধরতে। হ্যারির সাথে রওনা দিলো এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে । হ্যারির কাকা আমেরিকাতে সর্বরকম ভাবে ওদের সাহায্য করলেন । ব্যবস্থা করে দিলেন পার্ট টাইম চাকরী ওনার নিজস্ব রেস্টুরেন্টে। খুব নামি দামি রিভলভিং রেস্টুরেন্ট যার নাম ছিলো "নারভানা " - চল্লিশ তলা বিল্ডিং এর রুফ টপ এ। প্রাচুর্যে চোখ ধাঁধিয়ে যায় বিল্ডিং এ ঢোকা মাত্র। প্রচুর স্মার্ট ও চৌকষ ছাত্র ওখানে দিনে পড়াশুনা ও রাত্রে নিজের সুবিধে মতন চাকরি করে। হ্যারি কাকার তত্ত্বাবধানে হোটেল ম্যানেজমেন্ট শুরু করলো আর তন্ময় শুরু করলো ইউনিভার্সিটি তে বিসনেস প্রোগ্রাম- মেজর নিলো ফিনান্স । প্রথম সেমেস্টার এর পর থেকেই তন্ময় স্কলারশিপ পাওয়া শুরু

করলো। বছরের শেষে নাম উঠলো ডিন লিস্টে। গ্রাজুয়েশন এর আগেই ক্যাম্পাস এমপ্লয়মেন্ট পেলো Wall Street এর এক নামকরা ইনভেস্টমেন্ট ফার্মে ট্রেনী হিসাবে।

সেখানেই তন্ময়ের এর আলাপ হলো তানিয়ার সাথে। তানিয়ারও জন্ম আমেরিকা তে, ওর মা বাবাও ডাক্তারি পরীক্ষা পাস্ করে উচ্চশিক্ষার জন্য এখানে এসেছিলেন আর দেশে ফিরে যাননি। ওনারাও চেয়েছিলেন তানিয়া তাঁদের মতন ডাক্তার হোক কিন্তু যখন তানিয়া বিসনেস পড়তে চাইলো তখন বুঝেছিলেন বেশি আপত্তি করলে তানিয়া বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। তানিয়া ওর অনেক ভারতীয় বন্ধুদের দেখেছে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে।

তারপর ধাপে ধাপে উন্নতি করে আজ তন্ময় একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টমেন্ট এডভাইসার। যেদিন তার মনে হলো তানিয়াকে নিজের সহধর্মিনী হিসেবে কাছে পেতে চায় সেদিন বুকের ভেতরে চেপে রাখা অতীতের ফেলে আসা সেই একাকিত্ব, অভিমান জর্জরিত মন , নিরুদ্দেশ হওয়ার পরিকল্পনা , ওর সেই সময়কার মানসিক অবস্থা সব কিছু তানিয়ার সামনে খোলা পাতার মতন মেলে ধরলো।

সব কথা শুনে খুব একটা অবাক হলোনা তানিয়া। ভারতীয় মা-বাবারা সব দেশেই এক রকম, আমেরিকাতেও কোনো ব্যতিক্রম নেই। ডাক্তার হওয়াটা যে কতটা প্রয়োজনীয় সে কথা প্রতিমুহূর্তে মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁদের সন্তানদের। তাঁদের সেই অসম্পূর্ণ স্বপ্নকে কেউ কেউ যেমন পূর্ণতা দিয়েছে ,বহু সন্তান আবার তেমনি হয়েছে বাড়ি , শহর ও দেশ ছাড়া।

তানিয়ার সহযোগিতায় ও প্রেরণায় মা-বাবার সাথে যোগাযোগ ও আজকের এই যাত্রা। স্মৃতিচারণে এতই বিভোর ছিলো তন্ময় যে কখন এই লম্বা সফর শেষ পর্যায়ে এসে গেছে বুঝতেই পারে নি। বিগত দিনগুলি ফিরে পাওয়া যাবে না কিন্তু আজ মা-বাবার আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করবে নতুন জীবন তানিয়ার সাথে। বুক ভরা অভিমান নয়, একরাশ ভালোবাসা নিয়ে এখন মা-বাবার সাথে শুধুমাত্র মিলনের অপেক্ষা।..........

আবাসিক স্কুল – অন্য রূপে

মানস দত্ত

“আবাসিক স্কুল” বা “রেসিডেনসিয়াল স্কুল” আজকাল খুব চর্চার বিষয় এদেশে। কিছুদিন আগে, ব্রিটিশ কলোম্বিয়ার কেমলুপ শহরের এক পরিত্যক্ত রেসিডেনসিয়াল স্কুলের পাশে এক খালি ময়দানে, অচিহ্নিত কবরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা,প্রায় দুশোটা মানবদেহের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়াতে এখানকার রাজনৈতিক মহলে বেশ তোলপাড় শুরু হয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেদের ধারণা, ঐ সব কঙ্কাল, তাদের হারিয়ে যাওয়া নিকটজনের মৃতদেহের অবশেষ। তাদের মতে, স্কুলে থাকাকালীন যে সব ছাত্র ছাত্রীদের অকালে মৃত্যু হয়, স্কুলের কর্তৃপক্ষরা,সকলের অজান্তে ঐ স্থানে তাদের কবর দেয়।

কানাডার ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, আদিবাসী(Indigenous) ছেলেমেয়েদের পাশ্চাত্য সভ্যতায় শিক্ষিত করার জন্য ১৭শ শতাব্দীতে, রোমান ক্যাথলিক মিশনারীরা এদেশে চালু করে এই রেসিডেনসিয়াল বা আবাসিক স্কুল। আদিবাসীরা, তাদের ছেলেমেয়েদেরকে জোর করে কেড়ে নিয়ে, পাশ্চাত্য সভ্যতায় শিক্ষিত করার মিশানারীদের এই প্রচেষ্টাকে কোনদিনই ভালো ভাবে নেয়নি। মিশনারীদের ঐ কাজে কানাডা সরকারের সমর্থন থাকায়, আদিবাসীরা সরকারের উপর চিরকাল অখুশি। এই সব ঘটনার পর সরকারের প্রতি তাদের ক্রোধটা যেন আরো বেড়ে গেছে। হওয়টা খুবই স্বাভাবিক,কারণ যেসব ঘটনা ঐসব স্কুলে ঘটেছিল, ছাত্রছাত্রীরা যে ব্যবহার পেয়েছিল তা বেশ কষ্টকর, বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক।

আবাসিক স্কুল বহুদেশেই চালানো হয়। কারো চোখে স্কুল গুলো ভালো, আবার কারো কারো মতে তার ঠিক উল্টো। অনেকে মনে করে, অবাধ্য, দুষ্টু ছেলেমেয়েদেরকেই সামলাতে না পেরে বাবা মায়েরা পাঠিয়ে দেন ঐসব আবাসিক বা রেসিডেনসিয়াল স্কুলে। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটা একটু অন্যরকম। এসব ঘটনার খবর পড়তে পড়তে ফিরে যাই নিজের অতীত জীবনে, ছোটবেলার ফেলে আসা দিনগুলোতে। সেইসব দিনগুলো, যখন আমিও কাটিয়েছিলাম এক মিশনারী আবাসিক স্কুলে, ছাত্র হিসাবে।

স্কুলের প্রথম দিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। ঐদিন সন্ধ্যায়, বাবা আমায় পৌঁছে দিলেন দক্ষিন কলকাতার শহরতলীর কাছে, “নরেন্দ্রপুর“ নামে একটি গ্রামে, রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত এক আবাসিক স্কুলের “অভেদানন্দ ভবনে”, শুরু হ’ল আমার আবাসিক স্কুলজীবন। হ্যাঁ, তখন ‘নরেন্দ্রপুর’ একটা গাঁ-ই ছিল, পোস্টকার্ডের ঠিকানায় লিখতাম, গ্রাম: নরেন্দ্রপুর, পোস্ট অফিস: রাজপুর। তখন নরেন্দ্রপুরের এত নামডাক ছিল না। যানবাহনের যোগাযোগ ব্যবস্থার এত সুবিধাও ছিলনা।

আশপাশের অঞ্চল অজ পাড়া-গাঁ হলে হবে কি, স্কুলগন্ডির ভিতরটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সুন্দর প্রশস্ত পীচবাঁধানো পরিস্কার রাস্তা, রাস্তার দুধারে সুন্দর সুন্দর সব ফুলের বাগান, মাঝে কিছু বড়বড় গাছপালা, সুন্দর

রং করা বড় বড় building। যেন সবকিছু সুন্দর করে সাজনো, অপূর্ব এক শান্ত মনোরম পরিবেশ। এক কথায়, যেন প্রথম দেখাতেই ভাললাগার মত।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে, কিছু দু:স্থ ছাত্রদের সাহায্যার্থে, আমাদের পরম পূজনীয় বড়মহারাজ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, একটা মেস চালু করেন, কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে। স্বাধীনতার পর, ৫০শতকে, সেই মেসবাড়ী চলে আসে এই নরেন্দ্রপুরে গ্রামে। মিশনের সহকর্মীদের নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন এই ইনসটিটিউসন। শুরুতে, জুনিয়ার ও সিনিয়ার (বাংলা ও ইংরাজী উভয় মাধ্যম)স্কুল, কলেজ এবং অন্ধ ছেলেদের জন্য "ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমী" ছিল।স্কুল ছিল ক্লাস সিক্স (Class 6) থেকে ক্লাস ইলেভেন অবধি। পরে ক্লাস ফাইভ থেকে বারো ক্লাস করা হয়। কলেজে কেবল undergraduate, Science and Humanities বিষযগুলি পড়ানো হত। ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমীতে, অন্ধ ছেলেদের পড়াশনা ছাড়াও গান, বাজনা,হাতের বিভিন্ন কারিগরী শিল্পর শিক্ষাপ্রদান করা হত।

আমদের সবাইকে ছাত্রাবাসে(হোস্টেল) থাকতে হত, এটা বাধ্যতামূলক ছিল। ঐ ছাত্রাবাসগুলোকে বল হত "ভবন"। ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যদের নামেই ঐ ভবনগুলোর নামকরণ-যেমন, "অভেদানন্দ ভবন", "যোগানন্দ ভবন", "তুরিয়ানন্দ ভবন" ইত্যাদি। আমাদের দৈনন্দিন জীবন ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে চলত। সবাইকে তা মেনে চলতে হত। বিনা অনুমতিতে ব্যতিক্রম করারটাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হত এবং উপযুক্ত শাস্তিও পেতে হত তারজন্য। তবে সে শাস্তি কখনই বেদনাদায়ক ছিল না। দিন শুরু হত ভোরের ঘুম ভাঙ্গানো " মর্নিং বেল" শুনে, আর রাতের "স্লিপিং বেল(sleeping bell)" পড়লেই লাইট অফ করে শুতে যেতে হত সবাইকে। এই দুই বেলের মাঝখানে সারাদিনের রুটিনটা অনেকটা এইরকম ছিল, ভোরে ঘুম থেকে উঠে একটু শরীর চর্চা ড্রিল, পিটি করা, তারপর সকালের চা-বিস্কুট দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে, সাদা ধুতি চাদর পরে প্রেয়ার হলে ভগবানের আরাধনা করা। আরধনার শেষে, ঘরে ফিরে এসে পোষাক বদল করে ভবনের "স্টাডি হলে" ঘন্টা দুয়েক স্কুলের পড়াশনা করা। তারপর সবাই আসতাম ভবনের "ডাইনিং হলে" সকালের "হেভী ব্রেকফাস্ট" করতে। হেভী ব্রেকফাস্ট শেষ করে,সকাল ৯টায় জমা হতাম বিদ্যালয়ের এসেম্বলী (Assembly) হলে। সেখানে একটু প্রার্থনা আর একটু উপদেশবাণী শুনে চলে যেতাম নিজের নিজের ক্লাস ঘরে। ক্লাস চলত ১২টা অবধি। তারপর ভবনে ফিরে এসে স্নান আর দুপুরের লান্চ্ সেরে,বেলা দেড়টা নাগাদ ফিরে আসতাম স্কুলে। বেলা ৪টা অবধি চলত স্কুল।স্কু ল থেকে ফিরে সবাইকে চলে যেতে হত খেলার মাঠে। সন্ধ্যা হলে,ভবনে ফিরে, পরিস্কার হয়ে, স্ন্যাক্স সেরে আবার প্রেয়ার হলে এসে কিছুসময় ভগবানের আরাধনা করতাম, চঞ্চল মনকে শান্ত করতে। তারপর আবার ঘন্টাদুয়েক স্টাডি-হলে পড়াশুনা করে চলে আসতাম ডাইনিং হলে ডিনার করতে। ডিনারের শেষে ঘরে ফিরে এসে, বিছানা তৈরী করতাম আর রুমমেটদের সাথে একটু হাসি ঠাট্টা চলত "শোবার ঘন্টা" বাজা অব্দি। শোবার ঘন্টা বাজলেই লাইট অফ করে সোজা বিছানায়।

এই এক রুটিন চলত সারা বছর। বছরে তিনবার ছুটি হত -গরমের, পূজোর আর বছর শেষের বড়দিনের। বছরে ঐ তিনবারই আমরা বাড়ী আসতে পারতাম। বাড়ী ফিরে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এসে আনন্দ হত ঠিকই, তবে স্কুলের বন্ধুদেরও খুব মিস করতাম।

বাইরে থেকে অনকেই মনে করতেন, কি কষ্টই না করতে হচ্ছে আমাদেরকে। তাদের ধারণা ছিল,পৃথিবীর জনজীবন থেকে বর্জিত অন্য কোন এক প্রান্তে, কঠোর নিয়ম কানুন আর শাসনের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে আমাদেরকে। আসল ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তার উল্টো ছিল, আমরা সবাই খুব সুন্দরভাবে, আনন্দে এবং ভালোভাবেই কাটিয়েছি ঐদিন গুলো। আমাদের কোনরকম অসুবিধা হলেই, মহারাজরা, সিনিয়র দাদারা এগিয়ে আসতেন সাহায্য করতে। স্কুলের পড়াশুনা ছাড়াও আর অনেক কিছুই শেখানো হত আমাদেরকে। চরিত্র গঠনের দিকে নজর দিতেন মহারাজরা। ভালো আর মন্দের ফারাক বুঝিয়ে দিতেন। এক কথায় ওনারা আমাদেরকে এক সুস্থ, শিক্ষিত,স্বাবলম্বী নাগরিক হয়ে সমাজে বাঁচার জন্য তৈরী হতে সাহায্য করতেন। ওনারাও মিশনারী ছিলেন, কিন্তু কখনই কোন এক বিশেষ ধর্মকে প্রাধান্য দিতেন না, বা কোন আলোচনাও করতেন না। সব ধর্মকে সমান সম্মান জানানোর শিক্ষাই আমরা পেয়ছি তাঁদের কাছ থেকে।

লিখতে বসে অনেক কথাই মনে পড়ে। কত মজাই না করেছি তখন। সবাই মিলে রবিবারের সকালে সারা ভবনে সাফাই করার সময়, লম্বা করিডোরে জল ঢেলে সবাই মিলে সররা মারা, বা খাওয়ার ঘন্টা পড়ার সাথে সাথে কে আগে দৌড়ে ডাইনিং হলে লাইনের প্রথমে বসে মাছের মাথা খেতে পারে তা নিয়ে লড়াই করা, কত সব দুষ্টুমি যেমন লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া, আরও কত কি। বন্ধুদের নিক্ নেম দেওয়া, আর সেই নিক্ নেমে এখনও সম্বোধন করার কথা ভাবলে বেশ হাসি পায়। সত্যি সেসব এখন মধুর স্মৃতি।

তাই যখন কানাডার রেসিডেনসিয়াল স্কুলের ঘটনাগুলোর কথা শুনি, খুব বিচলিত বোধ করি। ভেবেই পাই না কেন এমন হল, ভুলটা কোথায় হয়েছিল। আমাদের মহারাজদের মতই-তো ঐ সব মিশনারীরা,তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনকে বিসর্জন দিয়ে, সমাজসেবায় নিয়োজিত হয়ে ঐ স্কুলগুলো গড়েছিলেন। কিন্তু পরিণতির কি তফাত। আজ,নরেন্দ্রপুরকে আমরা সাবাই ভালোবাসি, দেশের বেশীরভাগ লোকের দৃষ্টিতে এক অতি সফল প্রতিষ্ঠান, দেশের গর্ব।অধিকাংশ অভিভাবক চায় তাদের সন্তান পড়ুক নরেন্দ্রপুরে। অন্যদিকে কানাডার ইতিহাসে "রেসিডেনসিয়াল স্কুল" এক কালো অধ্যায় বলে পরিচিতি পাচ্ছে। সরকারকে বাধ্যহয়েই বন্ধ করে দিতে হয়েছে রেসিডেনসিয়াল স্কুলগুলোকে।

উদ্দেশ্য এক হলেও, রূপায়ণের পদ্ধতি আলাদা হওয়াতে প্রচেষ্টার পরিণামও হয়ে গেল ভিন্ন।

কি হবে?

অপর্ণা সেনগুপ্ত

এবছরে সমানেই বৃষ্টি হয়ে চলেছে, ঈশ্বরের এত দয়া যে একদিনও ঘাসে বা ফুলে জল দিতে হয়নি। গায়ে বাতের এত ব্যথা, তার ওপর রক্তের চাপ বেশী থাকায় সব সময়ই মনে হয় একটু বসে পড়ি, এরই মধ্যে একদিন দুপুরে একটা National Geographic ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এমন এক ছবির মুখোমুখি হলাম যা বুঝেও বুঝতে পারছিনা, মনে হল পৃথিবীর ছবিই হবে। আবার মনে হল কোন বৈজ্ঞানিক হয়ত আবিষ্কার করেছেন নতুন কোনও গ্রহ। পড়তে শুরু করলাম ছবির তলায় যা লেখা রয়েছে। লেখা রয়েছে এখন থেকে ৩০/৪০ হাজার বছর পরে এমন এক ভূমিকম্প আসবে যার ফলে পৃথিবীর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। থাকবেনা ক্যারিবিয়ান আর কৃষ্ণ সাগরের কোন চিহ্ন। আফ্রিকা মহাদেশ যোগ দেবে বহুকাল আগে ছেড়ে যাওয়া এশিয়া মহাদেশের সাথে। কোন চিহ্ন থাকবে না উত্তর-দক্ষিণ অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের, উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকাও এসে যোগ দেবে এশিয়া মহাদেশের সাথে। একদিকে থাকবে বিশাল জলরাশি আর অন্য দিকে থাকবে বিস্তর স্থল-ভাগ - এই কথা পড়তে পড়তে কোথায় আর কতক্ষণ ছিলাম সেই অবস্থার কথা বলতে পারবোনা, তবে ঈশ্বর যে কিছুক্ষণের জন্য এক নরক দর্শন করিয়ে ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে আসতে লাগল নানা ধরণের ভয়ংকর প্রশ্ন। তবে কি আমরা সবাই যাব মারা ? নাকি, কিছু লোক তখনও থাকবে বেঁচে ? কোন্ কোন্ দেশ থাকবে ? কিভাবে স্থির হবে সেই দেশের সীমারেখা ? না আবার যুদ্ধ হবে দেশের সীমারেখা নিয়ে ? তখনকার আবহাওয়া হবে কেমন ? থাকবে কি আগের মত ছয় ঋতুর আনাগোনা ? থাকবে কি আগের ঝর্ণা, পাহাড়, নদী-নালা ? কোন্ ভাষা, কোন্ ধর্ম থাকবে? না সবাই থাকবে একই ধর্মের তাঁবুর তলায় ? ধনী দেখাবে কি তার অর্থের অহংকার গরীবের উপর ? কালোর উপর থাকবে কি সাদার অত্যাচার ? পোশাকের হবে কি ? আসবে কি বর্ষার ধারা সেই ধরাতে গ্রীষ্মের ফেটে যাওয়া মাটিকে তাজা ক'রে ফসলে পরিপূর্ণ করতে ? বর্ষার শেষে থাকবে পুকুরের জল কানায় কানায় স্থির? পুকুর পাড়ের গাছে চিলটা তখনও কি অপেক্ষা করবে কখন একটা মাছ পুট করে উঠবে, আর সেটা ঠুকরে ধরে ফেলবে ?

কতক্ষণ ছিলাম এই অবস্থায় মনে নেই, মেয়ের ডাকে ফিরে আসতে হল স্বাভাবিক জীবনে। মেয়ের কথার উত্তর দিয়ে গেলেও, কোথায় যেন রয়েছে এক অবসাদের ভাব। মাথায় তখনও রয়েছে সেই দুঃস্বপ্নের ভার - কথা চলতে থাকলেও কথায় যেন পূর্ণ সহযোগ নেই। সময় থামেনা। সব কিছু শেষ করে তার গতির সাথে, তাই ওই দুঃস্বপ্নের রেশ-ও চলে গেছে তার গতির সাথে। জীবনের সব কিছুই চলেছে সমান ভাবে। জন্ম- মৃত্যু আছে, ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে, চাষী তার ফসল তুলছে প্রতিবারের মত

তার গোলায়, কুমোর বাসন পত্র তৈরী করে বাজারে করছে বিক্রি, ছেলে-মেয়ে চলেছে বিদ্যালয়ে, মা-বাবা যাচ্ছে কাজে। জন্ম - মৃত্যুর গতিও বন্ধ হয়নি, বলতে গেলে কোন কিছুর পরিবর্তন হয়নি তেমন। নতুন নতুন অপরাধের কাহিনীও এসে যাচ্ছে, কোন কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। জীবন আছে আজও তেমনই, সুখ - দুঃখ, রোগ, দরিদ্রতা আছে - আর এটাই তো স্বাভাবিক, আমাদের মত লোকের কাছে। খুন - অপরাধের খবরও ছাপানো হচ্ছে খবরের কাগজে। রেডিওতে আসছে কত তাপমাত্রা দিনের , মুখ্য বা প্রধানমন্ত্রী কোথায় গিয়েছেন, কার সাথে কোন চুক্তি হল, তার খবর। চাঁদে গিয়ে মানুষ বাস করবে, তার খবর। জগৎ চলছে মন্দের ভাল।

কিন্তু দিবা-দুঃস্বপ্ন যে এত তাড়াতাড়ি সত্যি হবে সেটা জানা ছিল না। ২০২০ থেকে চায়না পাঠাল এমন রোগ সারা বিশ্বে যা দিল শুধু মৃত্যুই নয়, সবাইকে করল সর্বহারা। করল এককে অপরের কাছে অস্পৃশ্য। মানব জীবনের এই অভিশাপের কথা কার জানা ছিল ? ঘরের থেকে বের হলেই নিজের মুখ ঢাকতে হবে। শুধু তাই নয়, বের হলেই দেখতে হবে সামনের লোক আমার থেকে কতটা দূরে, পেছনের লোক আমার থেকে কতটা পেছনে! হয়ে পড়েছে লোক নিজের মা-বাবার কাছে অচ্ছুত। হারাতে শুরু করল নিজের বউ-বাচ্চা, মা-বাবা, ভাই-বোন, আলাদা করে দিল নিজের প্রিয়জনকে, মৃত্যুর সময় রইল না হাত ধরার জন্য কোন লোক, কেউ দিলনা গুরুমন্ত্র কানে, না দিল জল মুখে শেষ সময়ে, না বলল বিদায়। কেবলই ভেবে চলেছি, সারা বিশ্বে সবাই মিলে কি এমন পাপ করলাম একই সময়, যার জন্য প্রায় দু বছর ধরে এই মহা - অভিশাপ ভোগ করে চলেছি ? কি করে প্রতিবেশীর দরজা বন্ধ হল অন্য প্রতিবেশীর কাছে ? হাট, বাজার, চলচিত্র হলের দরজা হল বন্ধ, বন্ধ হল মন্দিরের দরজা। লোকের কাজ নেই, কি করে মেটাবে বাড়ীর ভাড়া, বিজলীর বিল ? বাচ্ছা-রক্ষকের মাইনে? রোগটা যে কমেনি সেটা নয়, এটা কমেছে ত' অন্যটা এসে হাজির। এটা নাকি covid-19 এর থেকে ভয়ানক !

গীতায় বলা হয়েছে, বিশ্ব যখন মহা সঙ্কটের মুখোমুখি হয় তখনই শ্রীনারায়ণ তার থেকে রক্ষা করার জন্য নিজে দেহ ধারণ করেন। সত্যিই কি তিনি আসবেন এই মহামারী থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে ? মনে, প্রাণে ভিক্ষা রাখছি তাঁর পায়ে, তিনি যেন আসেন।

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবাশিস্যতে ।। "

"সময় ঘন্টা"

-রীতা বোস

ঐ বুঝি,
বাজলো সময় ঘন্টা,
ধুক্ পুক্ করে ওঠে
বুকের ভিতরটা ।
ত্বরা করো ত্বরা করো
বুঝে নিতে হবে যে, সবটা...............।।
চেক্ করে নিতে হবে
পুরো ফাইল্- টা
ঠিকঠাক্ আছে কিনা ।
****
যা- কিছু সংশোধন করবার,
করে নাও এই বেলা ।
সময় পাবেনা আর
সাঙ্গ হলে খেলা ।।

****
সময় যে বয়ে যায় ।।
কালের স্রোতের ন্যায়,
জীবন নদী খরস্রোতা
কুলু কুলু ব'য়ে যায়..........................।।
মৃদুমন্দ সমীরণ
সময়ের শিহরণ লাগে গায় ।।
****
কানে আসে ক্ষীণ স্বরে,
ঐ চেনা, চরণ- ধ্বনি,
বংশী- ধারী বসিয়া আছে পাহারায়,
মৃদুমৃদু হাসে, ঈশারায় ।।

সময়- ঘন্টা হাতে তাঁর
কখন যে বাজাবে,
সেই শুধু জানে তা.........।।
****
থেকো না অপেক্ষায়,
ঘরে ফেরার দায়, তোমার তো নেই ???
মুরলীধর আছেন বসি
তিনি এনেছেন, তিনি ই নেবেন,
সময় হ'লে ঘরে ডেকে,
শূন্য- ঘর পূর্ণ হবে,
আমরা ফিরবো এ ঘর থেকে ও- ঘরে ।।
সাঙ্গ হ'লে খেলা,
এই ধরণীতে..................................।।
****
শুরু হবে ও- পারের খেলা,
রাখাল বালকের সনে,
চরাবো ধেনু বাজাবো বেনু,
যদি সাথী হ'তে পারি তার,
ওই ধরণীতে...........।।

WONDERS OF THE NIGHT SKY – by Snigdha Banerjee

Pleiades/M45: picture courtesy Poulami Banerjee. Taken from Edmonton South Bortle zone 7, taken by Nikon Z7 on Televue with tracking and processed on PIS.

The sky has fascinated humans and had a captivating effect on human lives from the earliest of the times.

The Pleiades star cluster also known as the seven sisters or M45 are a group of more than 800 stars located about 410 light years from Earth in the constellation of Taurus.

Ursa major(commonly known as the "Big Dipper") is the 3rd largest constellation in the sky occupying an area of 1280 square degrees. It is located in the second quadrant of the Northern hemisphere(NQ2) and can be seen at latitudes between +90° and -30°. It contains 7 major messier objects including a few nebulas and galaxies.

In Hindu mythology it is said that "Ursa Major" represent the seven sages "Rishis", and they were happily married to the seven beautiful sisters named "Kritika" which represents the star cluster now "Pleiades/M45".

It was told that they all originally lived together in the Northern sky. But one day the God of Fire "Agni" fell in love with the astonishingly beautiful seven sisters (Kritika). Trying to forget his love, Agni wandered in the forest, where he met "Svaha" daughter of Daksha. It is said that Svaha represents the Star which is now called "Zeta Tauri".

It was love at first sight for Svaha. To conquer Agni's love Svaha then disguised herself each time as one of the seven sisters and kept meeting with him. He of course did not know this trick and thought that he has conquering the love of the seven very beautiful sisters (Kritika).

They were married and there were children born from Svaha and Agni, but the rumors spread that at least six of those seven sisters where the mothers of these children. Of course, after all these rumours the six Rishis rejected their wives and only one Rishi "Vasistha" would remain with his wife "Arundhati" as he found her faithful in marriage, which represents the now called the double stars "Mizar and Alcor".

Being rejected six sisters (Pleiades) moved away and remained together to form the star clusters far away from the Rishis (Big Dipper). Interesting fact is that there was documentation from 100s of years ago about a star cluster closer to the now called Big Dipper which has gradually migrated away and now remains it in its current location as M45/Pleiades.

According to the Hindu marriage ceremony the groom shows the bride the double stars of Alcor and Mizar(Vasistha and Arundhati) as an ideal couple & symbol of internal loyalty. The double stars are now located in the constellation "Ursa Major" and indeed proven to be bound gravitationally to each other.

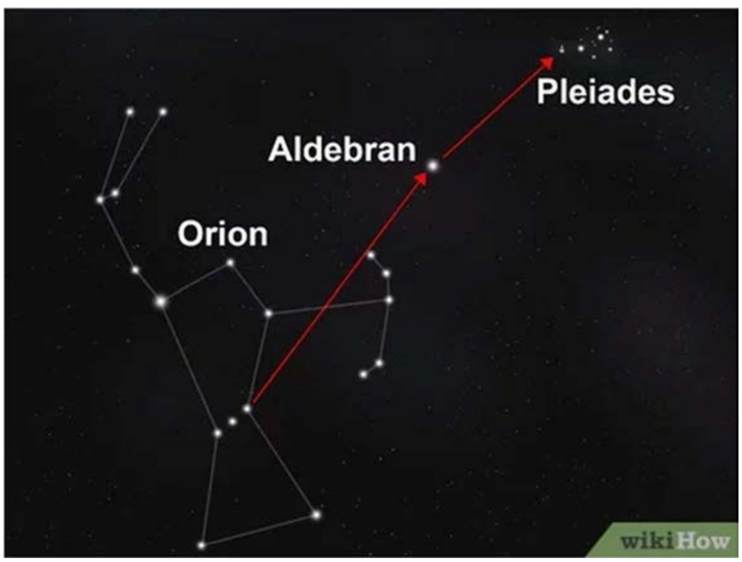

Picture courtesy wikihow.

These myths are proof of actual astronomical events that has happened many years ago. We also tried to make sense of these and made stories so that we and the coming generations would remember these seemingly trivial events with major consequences.

M42 – Orion Nebula located in the belt of Orion: picture courtesy Poulami Banerjee. Taken from Edmonton South Bortle zone 7, taken by Nikon Z7 on Televue with tracking and processed on PIS.

Fun fact: You can see the Pleiades and the Orion Nebula with naked eyes (with really good vision) or even a pair of binoculars in a moonless night. Just remember to dark adapt your vision which can be done in 30 minutes if you remain outside in a moonless night.

মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩ – ১৯৫৬)

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

শুরুর কথা

১৮৯৩, ৬ই অক্টোবর, ঢাকা শহর (বাংলাদেশ) থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে শ্যাওড়াতলি গ্রামে একটি ছেলের জন্ম। বাবার ছোট একটা মুদির দোকান, বাড়িতে পড়াশোনার সেরকম কোন চল নেই। আর্থিক অবস্থার দরুন ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা শুধু দুরাশা নয় অসম্ভবও ছিল। বাবা চায় ছেলে তার ব্যবসায় সাহায্য করুক। ছেলেটির কিন্তু পড়াশোনা করার অদম্য ইচ্ছা, সঙ্গে তাঁর মায়ের, দাদার আর মাস্টার মশাইদের উৎসাহ। এই ছিল পুঁজি।

কেউ কি সেদিন ভাবতে পেরেছিলেন যে সেই ছেলেটি ফেলো অফ দি রয়েল সোসাইটি অফ ইংল্যান্ড নির্বাচিত হবে (১৯২৭)? সেই ছেলেটি একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার' (১৯১৯) ও গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে দু বছরের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় গবেষণা করতে যাবে? কেউ কি সেদিন ভাবতে পেরেছিলেন যে বন্যা নিয়ন্ত্রণে ডি ভি সি প্রকল্পের প্রথম খসড়া রচনা এবং তার রূপায়ণও করবে? ভাবতে পেরেছিলেন যে এই সেই ছেলে যে কিনা কলকাতায় ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স স্থাপন করবে (১৯৫০)? যার পরিকল্পনা অনুযায়ী ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সাইন্স (IACS) বা সেন্ট্রাল গ্লাস এন্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট কে ঢেলে সাজিয়ে যাদবপুরে বিশাল এলাকা জুড়ে স্থাপন হবে? না ভাবা সম্ভব ছিল না, বরঞ্চ বাবাকে সাহায্য করে শ্যাওড়াতলির মুদির দোকানটাকে টিকিয়ে রাখাটাই ছিল স্বাভাবিক।

হ্যাঁ, শ্যাওড়াতলির সেই বালকই পরবর্তী কালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, দক্ষ প্রশাসক এবং একক ভাবে জয়ী ভারতীয় সংসদের সদস্য মেঘনাদ সাহা। যাঁর নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য নোবেল কমিটিতে অনেকবার প্রস্তাবিত হয়। কিন্তু নোবেল প্রাইজ তিনি পাননি। কিন্তু এসব তো অনেক পরের কথা। গোড়ার কথাটা ছোট করে বলে নিই ।

ছোটবেলার জীবন যুদ্ধ

সাত বছর বয়েসে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি। কিন্তু তারপর কি? গ্রাম থেকে সবচেয়ে কাছের মিডল স্কুল (শিমুলিয়া গ্রামে) হল দশ কিলোমিটার। প্রতিদিন হেঁটে আর বর্ষার দিন নৌকো করে যাওয়া সম্ভব নয়। এগিয়ে এলেন দাদা জয়নাথ। শিমুলিয়ার অনন্ত কুমার দাস নামের স্থানীয় এক ডাক্তারের বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করলেন। এই দাস দম্পতির সাহায্য না পেলে মেঘনাদের পড়াশোনা প্রাইমারি স্কুলেই ইতি হত। এঁদের প্রতি সারা জীবন মেঘনাদ কৃতজ্ঞ ছিলেন। মিডল স্কুল পরীক্ষায় ঢাকা ডিভিশনে প্রথম হয়ে মাসে চার টাকা বৃত্তি পেলেন। মিডল স্কুল থেকে জেলার সর্বোচ্চ স্থান নিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে

ভর্তি হন (১৯০৫)। মনে রাখতে হবে যে গ্রাসাচ্ছাদনের সংগ্রাম কিন্তু তাঁর সমানে চলছিল। স্কুলের বৃত্তি ও দাদার কাছ থেকে সামান্য কটা টাকাই তাঁর একমাত্র সম্বল। কিন্তু সে সুখও সইলো না।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। মেঘনাদ কি ভাবে যেন জাতীয় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন এবং দেশবিরোধী কাজের জন্য স্কুল থেকে বিতাড়িত হলেন, বৃত্তির টাকা বন্ধ হল। তবে ঢাকার কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে তাঁকে নেওয়া হয় - বৃত্তিও পেলেন । এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি বাংলার ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হন। ১৯০৯ সালে, তিনি ইন্টারমিডিয়েট পড়তে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান লাভ করেন। গণিত ও রসায়নে সর্বোচ্চ নম্বর। এবার যাত্রা ঢাকা কলেজ থেকে কলকাতায়। স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে শুরু করলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। B.Sc গণিতে অনার্স নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হলেন, প্রথম হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। M.Sc তে ও একই ফলাফল। প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় সাহা (১৯১৫)। জীবনযুদ্ধ কিন্তু এই চলার পথে অব্যাহত ছিল। বাবা মাকে অর্থ সাহায্য দিয়ে, নিজের পড়ার খরচ জোগাড় করেছেন ছাত্র পড়িয়ে - সকাল থেকে রাত অবধি সাইকেল চালিয়ে শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর গিয়ে টিউশন দিয়ে। দুজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিতের লেকচারার (১৯১৬) হয়ে যোগ দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ তখন পদার্থবিদ্যায় মাস্টার্স ডিগ্রি খোলার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক খুঁজছেন। জহুরীর চোখ নিয়ে বাছলেন মেঘনাদ সাহা আর সত্যেন বসুকেই - নিয়ে এলেন পদার্থবিদ্যা বিভাগে (১৯১৭)। যদিও তাঁরা নিজেরা মাস্টার্স করেছেন পদার্থবিদ্যায় নয়, ফলিত গণিতে।'।

আলোর চাপ (optical pressure) যে আছে সে কথা অনেকে বলেছেন, কিন্তু তা হাতেনাতে সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্য প্রমাণ করলেন মেঘনাদ সাহা। পেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে D.Sc উপাধি (১৯১৮).

আলোর দিশারী - মেঘনাদ সাহা

প্রিস্মের মধ্যে দিয়ে আলোর যে বর্ণালী (Spectrum) বা রঙের সমাহার সে তো আমরা ছোটবেলায় পড়েছি। বৈজ্ঞানিকরা দেখলেন যে বিভিন্ন কঠিন বস্তু গরম করতে থাকলে তার থেকে আলো বেরোয়, মৌল গ্যাস থেকে পাওয়া যায় বর্ণালী রেখা। আবার হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম, আয়রনের বর্ণালী রেখার অবস্থান থেকেই চিহ্নিত করা যায় মৌলগুলিকে। কিন্তু গোল বাধলো অন্য জায়গায়। সূর্য বা তারার মধ্যের অগ্নিকুণ্ড থেকে প্রাপ্ত বর্ণালী বিশ্লেষণ করে কিন্তু চেনা কোন মৌল গ্যাসের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু কেন এই ব্যতিক্রম? এই ধাঁধার উত্তর খুঁজতে গিয়ে মেঘনাদ সাহা আবিষ্কার করলেন এক যুগান্তকারী তত্ত্ব। তিনি অঙ্ক কষে দেখালেন যে সব পদার্থের বর্ণালীর ছবি আমরা পরীক্ষাগারে দেখেছি সেই সব পদার্থের অবস্থান বৈদ্যুতিক ভাবে নিরপেক্ষ (Electrically Neutral)। কিন্তু সূর্য অথবা তারাদের মধ্যে প্রচণ্ড চাপ ও তাপমাত্রায় পদার্থের যে অবস্থা তা কিন্তু তড়িৎ-নিরপেক্ষ নয়, বরং সেই গ্যাসীয় অবস্থা আসলে আয়নিত (Ionized) অবস্থা। পদার্থের পরমাণু ভেঙে আয়নিত এই অবস্থার (Thermal Ionization) সৃষ্টি। এখন এই আয়নিত অবস্থায়, বিভিন্ন মৌল গ্যাসের মিশ্রণ থেকে প্রাপ্ত বর্ণালীরও পরিবর্তন ঘটে - পরীক্ষাগারের চেনা বর্ণালীর সঙ্গে তার মিল পাওয়া যায় না। তিনি একটি সমীকরণও বের করলেন (Ionization Equation) যা থেকে তারাদের তাপমাত্রা এবং তার মধ্যে কি কি মৌল গ্যাস কি অনুপাতে আছে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া

যায়। তাঁর এই গবেষণালব্ধ তত্ত্ব প্রকাশিত হল “Ionization in the Solar Chromosphere”– Philosophical Magazine Series, London 1920 and “On a physical Theory of Steller Spectra”– Proceedings of the Royal Society. আরও অনেক গবেষণা পত্র লিখলেন। ফেলো অফ দি রয়েল সোসাইটি অফ ইংল্যান্ড নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৯২৭) ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে দু বছরের জন্য বিদেশে গেলেন, উদ্দেশ্য তাঁর তত্ত্বকে যন্ত্রের সাহায্য পরীক্ষাগারে প্রমাণ করা। সম্ভব হয়নি সহজে।

অনেক বার নোবেল কমিটির কাছে তাঁর গবেষণা প্রস্তাবিত হয়। কিন্তু তিনি নোবেল প্রাইজ পাননি। যুক্তি নাকি ছিল যে সাহার কাজ কোন আবিষ্কার নয়, শুধুমাত্র কিছু জানা তত্ত্বের সুন্দর প্রয়োগ (not a discovery but a nice application)!! পরবর্তী কালে তিনি নিউক্লিয়ার ফিসিক্সে মনোনিবেশ করেন।

সমাজ সেবায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ

একজন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবেন, পত্র পত্রিকায় তাঁর গবেষণালব্ধ ফল ছাপা হবে, বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিক খুলে যাবে সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা ছিলেন একটু অন্য ধরণের। তাঁর গবেষণার কাজ শুধু পরীক্ষাগারে বা পত্র পত্রিকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি আজীবন চেষ্টা করেছেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল কি ভাবে মানুষের কল্যাণে, মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করতে সাহায্য করবে। তিনি ছিলেন সেই জেদী বিজ্ঞানী যিনি কিনা যা ধরবেন তা করেই ছাড়বেন। বিজ্ঞান ও দেশসেবা তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। ছোটবেলায় তিনি দেখেছিলেন গ্রাম বাংলার ভয়াবহ বন্যা। কত মানুষের ঘর বাড়ী ধুয়ে মুছে যেতে, অসহায় মানুষের হাহাকার। ১৯১৩ সালে দামোদর নদীর বন্যায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়, বাড়িঘর, গবাদি পশু জলের তোড়ে ভেসে যায়। বন্যাত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন M.Sc পাঠরত মেঘনাদ। তখন থেকেই বোধহয় ভেবেছিলেন যে দামোদর উপত্যকায় এই বাৎসরিক বন্যা এবং হাজার হাজার মানুষের এই দুর্গতির একটা সমাধান করতে হবে। ১৯২৩ সালে উত্তরবঙ্গেও এক ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। সেখানকার বন্যাত্রাণেও তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

দামোদর উপত্যকায় বন্যা দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্থায়ী সমাধান সূত্র বার করতে হবে। তিনি খুঁজতে লাগলেন জার্মানি, আমেরিকা, রাশিয়া তাদের বিভিন্ন নদীর সমস্যার সমাধান কি ভাবে করে। লিখলেন তাঁর গবেষণার ফল (‘Modern Review’- তে প্রকাশিত), জানালেন বাংলায় নদী সংক্রান্ত পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারের (River Physics Laboratory) প্রয়োজন। বহু টানা-পোড়েনের পর ১৯৪২ সালে তৈরী হল: "The River Research Institute of Bengal". দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়েও অনেক লেখালিখি (‘Science and Culture’- তে প্রকাশিত) করলেন, দেখালেন আমেরিকায় কি ভাবে টেনিসি নদীতে ড্যাম (dam) বসিয়ে নদী নিয়ন্ত্রণ করা হয় (Tenneesse Valley Authority - T.V.A). সেই অনুসারে দামোদর নদী নিয়ন্ত্রণে মেঘনাদ সাহা একটি পরিকল্পনাও করে দিলেন। এতদিনে কর্তাদের কানে জল ঢুকলো, তাঁর পরিকল্পনা মাফিক শুরু হলো - Damodor Valley Corporation (D.V.C) প্রজেক্ট।

বিজ্ঞানকে জন কল্যাণে নিয়ে যাওয়ার এই রকম অসংখ্য উদাহরণ আছে তাঁর ঝুলিতে - দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া, শিক্ষার অভাব, গবেষণাগারের অভাব, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, অস্পৃশ্যতা, হিন্দু-মুসলমানের মিলন আরও কত কি নিয়ে যে তিনি লড়েছিলেন তার হিসেব নেই। ১৯৫২ সালে নির্দল প্রার্থী হয়ে লোকসভা ভোটেও তিনি জিতেছিলেন। একমাত্র উদ্দেশ্য তার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা দিল্লির দরবারে তুলে ধরা, এবং সেটা করিয়ে নেওয়া - বহু বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে।

১৬ই ফ্রেবুয়ারী ১৯৫৬ সাল, সেদিন, পার্লামেন্টে যাওয়ার ঢালু (slope) রাস্তা দিয়ে উঠছেন। সেদিন ছিল বাজেট সেশন। হাতে অনেক কাগজ - রিফিউজি সমস্যা, বেকারত্ব, চাকরি থেকে বহিষ্কার, নদী-নিয়ন্ত্রণ - এইসব বহু সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান আজ পেশ করতে হবে যে। হঠাৎই মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। আর উঠলেন না। চলে গেলেন সরস্বতী পুজোর দিন সরস্বতীর এক বরপুত্র - বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা।

যুক্তিবাদী ও মুক্তমনা মেঘনাদ সাহা

মেঘনাদ সাহা আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তা হল বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে এবং যুক্তির বিচারের ভিতর দিয়ে জগৎটাকে দেখতে। তিনি নিজে এ ব্যাপারে কোনোদিন আপস করেননি। বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়েই মানুষের কল্যাণ এবং একটা জাতির উন্নতি সম্ভব। কুসংস্কার, বিজ্ঞানের গতি রোধ করে, অতীতকে আঁকড়ে পড়ে থাকা একটা মূর্খামি ছাড়া কিছুই নয়। এই নিয়ে জীবনে তাঁকে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তবে তিনি কিন্তু মুক্তমনাও ছিলেন। বৈদিক সাহিত্য শুধু নয় পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ তিনি পড়েছিলেন এবং তাঁর সমালোচকদের সেই প্রাচীন সভ্যতার উদাহরণ দিয়েই তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন। প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্তদের মত যুক্তিবাদী ও মুক্তমনা উত্তরসূরী মেঘনাদ সাহাকে প্রণাম জানাই।

তথ্য সংগ্রহ: ১. মেঘনাদ সাহা রচনা সংগ্রহ - সংকলন ও সম্পাদনা দীপককুমার দাঁ , ২. The Life and Work of Meghnad Saha - by Kamalesh Ray, ৩. জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা - শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি:

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় : বিশ্ব সাক্ষী ইনি তথাকথিত কোন লেখক নন তবে বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ পাঠক বলা যেতে পারে। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, এখন অবসরপ্রাপ্ত । বিভিন্ন বই এবং ইন্টারনেট ঘেঁটে বাংলায় তথ্যপূর্ণ কিছু লেখার চেষ্টা করেন। বাংলা লেখা পড়তে সবাইকে উৎসাহিত করেন। স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া কিছু তথ্য বাঙালির সামনে তুলে ধরা ওনার একটি প্রিয় কাজ। বিদেশী ভাষা শিক্ষা এবং বিদেশী সাহিত্য থেকে বাংলায় অনুবাদ করার প্রতিও ঝোঁক আছে।

থিমের বাহার।

শুকদেব চট্টোপাধ্যায়

দুর্গা পুজোয় এখন থিমের বোলবোলা। একটু থিমের ছিটে না দিতে পারলে ঠিক কৌলীন্য আসে না। মফঃস্বলের পুজো হলেও যুবক সংঘের এ ব্যাপারে বেশ নামডাক আছে। প্রতিবারই বিচিত্র থিমের নানান কেরামতি থাকে। একবার তো "যুদ্ধ নয় শান্তি চাই" থিম ফোটাতে গিয়ে অস্ত্র ছাড়া মা দুর্গা আর অসুরকে সামনা সামনি এমনভাবে বসিয়েছিল যে দেখলে মনে হবে যেন ভাইফোঁটা হচ্ছে।

বিচিত্র এই সব চিন্তা ভাবনার মূল সরবরাহকারী হল পোল্টুদা। এলাকায় বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, তাছাড়া পুজোয় মোটা টাকা যোগান দেয়, ফলে ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছেয় ওর থিমের যোগানটাকেও সকলকে মেনে নিতে হয়। গতবার সাক্ষরতার ওপর ফোকাস করার জন্য দুর্গার ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে বর্ণ পরিচয় ধরিয়ে দিয়েছিল। দামড়া ছেলেমেয়েদের হাতে বর্ণ পরিচয় দেখে কোন এক ফক্কড় দর্শনার্থী মন্তব্য করেছিল, "বড় দেরীতে লেখাপড়া শুরু করল।" স্বেচ্ছাসেবকেরা যখন বলেছিল বইটা সাক্ষরতার একটা প্রতীক মাত্র, তখন উত্তর এসেছিল, "প্রতীকটা বয়স অনুযায়ী হলে ভাল লাগত, একটা টেস্টপেপার ধরিয়ে দিলেই ত হত।" যখন বলা হল যে অত ভারি জিনিস চারদিন ধরে রাখা সম্ভব নয়, তখন রসিক লোকটি বলেছিল "সেক্ষেত্রে কে সি নাগ ট্রাই করতে পারতেন।" পাঁচজনে পাঁচকথা বলবেই, সবেতে কান দিলে চলে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সেবার যুবক সংঘের পুজো মিউনিসিপ্যালিটির বিচারে থিমেতে তৃতীয় পুরষ্কার পেয়েছিল। বিচারকদের মধ্যে নিশ্চই ছিদ্রান্বেষী কেউ ছিল না, তাই এই নির্ভুল বিচার। তবে শোনা গেছে বিচারকদের কেউ কেউ নাকি পোল্টুদার ইয়ার দোস্ত ছিল। সে যাই হোক, মন্ডপে কাপ শোভা পেয়েছে এটাই বড় কথা।

এবারে পোল্টুদার ইচ্ছে ঠাকুরের একটা জীবন্ত ভার্সান করার। মূল মণ্ডপে থাকবে সনাতন প্রতিমা, পাশেই আর একটি মণ্ডপে পাড়ার ছেলে মেয়েরা সাজবে জ্যান্ত ঠাকুর। সকলের মাথায় হাত, সারাদিন সং সেজে দাঁড়িয়ে থাকা কারো পক্ষে সম্ভভ নয়। সমস্যাটা বুঝতে পেরে পোল্টুদা বলল— তোরা যা ভাবছিস তা নয় রে পাগল। রাতে যখন লোকজন বেশি থাকে তখন এক ঘন্টার একটা লাইভ শো থাকবে। ওই মহালয়ায় টিভিতে যে অনুষ্ঠানগুলো দেখিস, অনেকটা ওইরকম। তবে নাচানাচির কোন সিন নেই, কেবল দাঁড়িয়ে থাকা।

সপ্তমী থেকে নবমী সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা করে রক্তমাংসের ঠাকুরের শো হবে এমনটাই ছিল পোল্টুদার সাজেশান। গেটের মাথায় লেখা থাকবে "সন্ধ্যায় জীবন্ত ঠাকুর"। থিম ঠিক হওয়ার পরেই শুরু হল আর্টিস্ট খোঁজার পালা।

বিজনের শক্তপোক্ত শরীর। একটু মাথামোটা। অসুরের জন্য আদর্শ। একবার বলতেই রাজি হয়ে গেল। শীতলা সুইটসের নাদুস নুদুস অলোক ময়রা হল গণেশ। দেশে অনেক যাত্রাপালা করেছে, ফলে এসব ওর জলভাত, বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অলোক জানিয়েছিল। দোকানের মালিক ওকে ছাড়তে চাইছিল না। পুজোর ওই ভিড়ের সময় অলোক অতক্ষণ দোকানে না থাকলে খদ্দের সামলান মুশকিল হবে, এইসব বলে গাঁইগুঁই করছিল। পল্টুদা নিজে গিয়ে একটু নরমে গরমে বলাতে আর না করার সাহস পায়নি। মা দুর্গা হওয়ার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে নিশ্চিন্ত করলেন অনন্যা বৌদি। আপত্তি না থাকলে ওনার মেয়ে সুলগ্না সরস্বতী হতে পারে এও জানালেন। আবদার একটাই, মঞ্চে ওনার নাচের স্কুলের একটা বিজ্ঞাপন থাকবে। মা ও মেয়ে দুজনেই সুশ্রী, মানাবে ভাল, ফলে ঐ ছোট্ট আবদারে কেউ না করেনি।

প্রশান্ত বাবু মুখচোরা মানুষ, অল্পদিন হল পাড়ায় ভাড়া এসেছেন, তবু ওনারা বেশ পরিচিত বাড়ি। কারণটা ওনার দুই মেয়ে, চিনি আর মিনি। মিনি মাত্র ষোল বছর বয়সেই চালচলন আর চটকে পাড়ার ছেলেছোকরাদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে। লক্ষ্মী হওয়ার প্রস্তাব দিতে মুখের ওপরেই বলে দিল— পূজোর দিনে অমন সং সেজে দাঁড়িয়ে থাকা, মাগো না না।

কমিটির ছেলেপুলেরাও খবর রাখে। কার্তিকের জন্য ধরল ঋত্বিককে। ছেলেটার নাম হয়ত অন্য কিছু। সারাক্ষণ ঋত্বিক রোশনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তাকে নকল করার ফলে এখন ঋত্বিক নামেই লোকে তাকে চেনে। নিজেকে আরো এক্সপোজ করা যাবে হয়ত এই আশায় সম্মতি জানাল।

কান টানলে মাথা আসে। ঋত্বিকের খবরটা কানে যেতেই মিনি নিজে থেকেই একদিন এসে বলল- আপনাদের প্রস্তাবে আমি রাজি, তবে লক্ষ্মী নয় আমি সরস্বতী হব।

যার সাথে মিনি পুজোর কদিন ঘুরবে ভেবেছিল সেই যখন কার্ত্তিক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল তখন সরস্বতী হলে অন্তত পাশে তো থাকা যাবে। সবদিক বিচার করে দিকবদল মঞ্জুর হল।

ঠাকুরের এই জীবন্ত প্রদর্শনীতে কেবল ঠাকুররাই জীবন্ত তাদের বাহনরা নয়। বাহন জীবন্ত করা অনেক রিস্কের ব্যাপার। ওগুলো নানা সাইজের পুতুল দিয়ে ম্যানেজ করতে হবে। সাইজ মাফিক বাহন যোগাড় করার জন্য লাল্টু আর পচাকে ক'দিন কুমারটুলিতে ঘোরাঘুরি করতে হল। শুধু বাহন লাগবে শুনে ওখানকার লোকজন প্রথমে ওদের পাগল ঠাউরেছিল। থিমের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে ওরা এক আধটা করে এদিক ওদিক থেকে এনে দিচ্ছে। আসলে ঠাকুর ছাড়া শুধু বাহন তো টাটকা হবে না, সব ওই

ভাসানের পরে নদী থেকে তোলা মাল। অন্যগুলো যাহোক চলে যাবে কিন্তু সিংহটার অবস্থা খুব খারাপ। সমস্ত কেশর ঝরে গিয়ে তার হাল বড়ই করুণ। যাইহোক কদিন বাদে ঘষেমেজে জিনিসগুলোকে একটু উপস্থাপন যোগ্য করে ডেলিভারির সময় শিল্পী ভদ্রলোক হেসে বললেন— আমার জীবনে এমন অর্ডার এই প্রথম।

প্রাইমারী স্কুলের বড় ঘরটা ক'দিন রিহার্সাল এর জন্যে বলে কয়ে ব্যবস্থা করা হল। নাচের স্কুলের অভিজ্ঞতা থাকার কারণে পরিচালকের দায়িত্বটাও অনন্যা বৌদিই সামলাচ্ছেন। সকলের সুবিধে মত সন্ধ্যের দিকে রিহার্সালের সময় ঠিক করা হয়েছে। প্রথম দিন সকলেই হাজির, যথা সময়ে রিহার্সাল শুরু হল। কাকে কি করতে হবে বুঝিয়ে দেওয়া হল। এতে তো আর ডায়লগ কিছু নেই, কেবল পজিশন আর দাঁড়াবার ভঙ্গিমাটা ঠিকঠাক হলেই হবে। যে যার পজিশনে ঠিকঠাক দাঁড়ালেও ভঙ্গিমা কিছুতেই ঠিক থাকছে না। সকলেই ক্ষণে ক্ষণে নড়াচড়া করছে। সন্ধ্যের সময় মশককুলের ভয়ানক আক্রমণ কাউকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। মশা তাড়াবার বিভিন্ন সরঞ্জাম আনিয়ে খানিকটা ঠ্যাকা হল। যে যার পজিশনে আবার দাঁড়াবার পর অনন্যা বৌদি লক্ষ্য করলেন ওনার মেয়ের কিছু অস্বস্তি হচ্ছে। ইশারায় কিছু বলতে চাইছে। কাছে যেতেই সুলগ্না মাকে আড়ালে ডেকে জানাল যে তার পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। শরীর খারাপ কিনা জিজ্ঞেস করাতে মার কানে কানে জানাল যে এমন বোটকা গন্ধে আর কিছুক্ষণ থাকলে কেবল শরীর খারাপ নয় জ্ঞানও হারাতে পারে। মেয়ের অস্বস্তির কারণ যে অলোক ময়রা তা অনন্যা অল্পসময়েই বুঝতে পারলেন। গণেশের অভিনয় তাই ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত থাকার কথা কিন্তু মেয়েদের সামনে লজ্জা করবে বলে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে আছে। গেঞ্জিটা কোন এক সময় সাদা ছিল কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অধিক দিন ধারণ করার ফলে এখন রঙিন। তার ওপর অভিনয়টা প্রাণবন্ত করতে গিয়ে অস্ত্র সমেত বাঁ হাতটা বেশ খানিকটা ওপরে তুলে রেখেছে। ফলে উন্মুক্ত অঙ্গের বাস বিনা প্রতিরোধে চারিদিকে খেলে বেড়াচ্ছে। একেবারে পাশে থাকায় সুলগ্নার কষ্টটা সবথেকে বেশি। সেদিনের মত রিহার্সাল ওখানেই শেষ।

কয়েকদিন অনেক চিন্তা ভাবনার পর ঠিক হল ডেকরেটারের কাছ থেকে দুটো ব্লোয়ার আনিয়ে দুদিক থেকে চালিয়ে দেওয়া হবে। তাতে মশাও উড়ে যাবে গন্ধও উড়ে যাবে। তবে পাখা একটু তফাতে রাখতে হবে তা না হলে মশা আর গন্ধর সাথে গায়ের কাপড় চোপড়ও এলোমেলো হয়ে একটা বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে। প্রতিরোধ আরো সুরক্ষিত করতে অলোকের জন্য কেনা হল গণেশের রং এর সাথে মিলিয়ে গোলাপি রঙের স্কিন টাইট ফুলহাতা পাতলা গেঞ্জি। দূর থেকে দেখলে ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃতই মনে হবে। এছাড়া টানা একঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর বলে, আধ ঘন্টার শো এর পর পনের মিনিটের হাফ টাইম দিয়ে আবার

আধ ঘন্টা শো হবে। রিহার্সালে আর তেমন কোন সমস্যা হয়নি। কেবল সরস্বতী মাঝে মাঝেই কার্তিকের একেবারে গায়ে গায়ে চলে আসায় অনন্যা বৌদির কাছে মৃদু ধমক খেয়েছিল।

পুজোর মুখে খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই কাতারে কাতারে মানুষ এল শো দেখতে।

অলোক ময়রার গায়ের গন্ধ, মশার কামড়, সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে পোল্টুদার লাইভ শো হিট করে গেল। এবার আর থার্ড নয় থিমেতে যুবক সংঘ একেবারে ফার্স্ট। বেশ কিছু পুজো কমিটি পোল্টুদাকে ধরেছিল সামনের বারের থিমের জন্য, অনেক প্রলোভনও দেখিয়েছিল, কিন্তু পোল্টুদা সকলকেই খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়। জানিয়ে দিয়েছে যে ওর প্রোডাক্ট এক্সক্লুসিভলি যুবক সংঘের জন্য। অনন্যা বৌদির নাচের স্কুলেরও এখন বেশ বাড় বাড়ন্ত। অলোকের গণেশ সাজার খবরটা কিভাবে যেন ওর গ্রামে পৌছে গেছে আর তাতেই কেল্লা ফতে। সামনের শীতে বেশ কটা যাত্রার খেপ কনফার্ম। রাজনীতিতে অসুরের হেবি ডিম্যান্ড, তাই বিজনের সাথে ইতিমধ্যেই নেতারা যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছে। বিজনের মত শক্তিমান এবং বুদ্ধিহীন অনুগামী এই লাইনে আদর্শ।

সর্বোপরি মিনি আর ঋত্বিক এখনও পাশে পাশেই আছে।

পোল্টুদার আগামী পুজোর থিমও রেডি। বিষয় এখন বলা যাবে না, তথ্য পাচার হয়ে যেতে পারে।

লেখক পরিচিতি -

শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম কোলকাতায় হলেও পিতার রেলের চাকরির কারণে শৈশবের অনেকটা কেটেছে বিহারের নানা প্রান্তে। পৈতৃক ভিটে ছিল বিহারের দানাপুরে। পড়াশুনা আরম্ভ পালামৌ-এর প্রত্যন্ত গ্রাম মহম্মদগঞ্জের মিডল স্কুলে, পরে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুর থেকে স্কুলের গণ্ডী পার হন। গোয়েঙ্কা কলেজ থেকে বাণিজ্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কর্মজীবনের সূচনায় রেলে কিছুটা সময় কাটিয়ে যোগ দেন ব্যাঙ্কে। লেখকের নানা স্বাদের লেখা বিভিন্ন সময়ে দেশ ও বিদেশের বেশ কিছু পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত এবং প্রশংসিত হয়েছে।

প্রকাশিত বই- ১। গল্পমঞ্জরি ২। গল্পেন্দু

প্রকাশিত হতে চলেছে – কোলকাতার গত কাল।

ঢেউ

-সুদীপ্ত চক্রবর্ত্তী

ক্রমাগত উত্থান আর পতন
এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি
ঠেলেই চলেছে জীবনের গন্তব্য।

এই ঢেউ এর মাথায় -
আবার স্রোতের তলায় তলিয়ে যাওয়া।

ঘূর্ণিপাকের মহড়ায় খড়কুটো হয়ে
ভেসে থাকে অস্তিত্ববোধ
হারায় না দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা
তবু এক বিন্দুবোধ কাজ করে।

ঢেউ স্পর্শ করে না -
শুধু কলধ্বনি শ্বাসরোধ করে,
ডুবলেও উঠতে হয় জীবনের ডাঙায়
আবার সমাধি পরিবেষ্টিত বোধশক্তি
লজ্জায় ভেসে থাকতে পারে না,
তাই তক্ষুনি আবার ডুবে যেতে হয়।

এই চিরকালীন খুব সাঁতার
প্রহরীর মতো দিন গোনে,
একদিন ঢেউয়ের পারে
এই খড়কুটো জীবনের ডিঙি
তীরে তীরে নোঙর করে।
সেখানেও চোরাবালি......
তাই আবার ফিরে যেতে হয়,
ঢেউয়ের আস্ফালনের দোলায়
ক্রমাগত জীবন স্নানই করে।

কবিপরিচিতি

সুদীপ্ত চক্রবর্ত্তী।

জন্ম ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৭, অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার শালবনি তে। আশৈশব সাহিত্য প্রেমী, কবিতা লিখছেন কৈশোর থেকে। শিবপুর বি ই কলেজ এর স্নাতক (১৯৭৮), পেশায় বাস্তুকার, হলদিয়া থেকে অবসরপ্রাপ্ত; আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সৈকত ও বন্দর বিশেষজ্ঞ। উদার মুক্ত স্বাধীন যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে , আবহমান সময়ের বিমূর্ত রূপ সুদীপ্তর লেখনীতে ধরা দেয়। শুন্যতায় হেলান দিয়ে সন্ন্যাসীর নিবিষ্টতায় কবিতার নির্জন মগ্ন উপাসক এই কবি। কবি নিজের সাথেই কথা বলেন, পাঠক কান পেতে থাকেন শোনার জন্য। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - অন্তর্লীনা (২০০৫) ও মৌন অরণ্য (২০১০)

সুদীপ্ত একজন অনুভবী কবি এবং ব্রিলিয়ান্ট পোর্ট এন্ড হার্বার এক্সপার্ট. ওর কবিতা কে আপনাদের সামনে আনতে পেরে খুব ভালো লাগছে, বিনীত - তাপস দাস

রক্ত ঋণ

সফিক আহমেদ

Safique Ahmed from Alberta, Canada, presently living in Texas USA, is Engineer by profession and Poet, novelist, and literary activist by passion. He has travelled the world for his profession but never forgot his Indian root and love for literature. His poems, stories and blogs has been published in magazines from many countries in the world including, India, Bangladesh, USA, Canada and Middle East. He has several publications of book of his poems. He actively participates in many literary societies to promote Indian culture and literature in international platform.

চারিদিকে শ্বেতশুভ্র তুষারপাতের মধ্যে, রাত্রের রাস্তার ঝলমলে আলো তৈরী করেছে এক অপার্থিব পরিবেশ। টরন্টো সানিব্রুক হেল্থ সাইন্স সেন্টার এ ট্রমা ইউনিট, অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ একেবারেই ব্যস্ত নয়।সিনিয়র নার্স মেরি, রাতের ডিউটি তে ডিউটি রুমের জানলা দিয়ে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর ফিরে যাচ্ছে তার ফেলে আসা দিনপঞ্জিকার ছেড়া পাতায়। অনিন্দ্য আর মারিয়াম নস্কর অভিবাসন নিয়ে নেমেছিল টরন্টো এয়ারপোর্ট এ নতুন দেশে নতুন জীবন শুরু করতে। সে রাত্রে নতুন শহরে সব ই অচেনা। শুধু চেনা লেগেছিলো আকাশের একথালা পূর্ণিমার চাঁদ। অনিশ্চিত পরিবেশে পরম স্নেহে ত্রস্ত মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে ছিল এই চাঁদের আলো। দেশের প্রতিষ্ঠিত জীবন ছেড়ে এসে, একটা পরিণত গাছকে সমূলে উৎপাটিত করে নতুন জায়গায় প্রতিস্থাপন করার অভিঘাত সহ্য করে, ধীরে ধীরে দুজনেই শুরু করেছিল জীবন যুদ্ধ। দেশের টাকা মুদ্রাবিনিময়ে হ্রাস পাওয়ার ধাক্কা, দেশের শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি পাওয়ার যুদ্ধ আর কোনো কাজ শুরু করার জন্য এই দেশের কাজের অভিজ্ঞতার অন্যায় প্রয়োজনীয়তার গোলক ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে অস্থায়ী কাজ দিয়ে শুরু হয়েছিল এই দেশের মুদ্রা উপার্জন। দুজনের উপার্জন এ আস্তে আস্তে এসেছিলো স্থায়িত্ব। বাসস্থান, গাড়ি সব ই হয়েছিল আর অনিন্দ্য ও পেশাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পেয়ে যাওয়ায় সংসারে নতুন মুখের আগমন হয়েছিল।এসেছিলো আরিয়ান।

চিন্তার রেশ ছুটে গেলো অ্যাম্বুলেন্স এর আওয়াজ, আলো আর সিনিয়র সার্জনের ডাকে। নির্লিপ্ত দক্ষতায় অপারেশন থিয়েটার এ সাহায্য করা, রক্ত স্যালাইন দিয়ে রোগীকে বেড এ স্থানান্তরিত করা, রিপোর্ট লেখার পর হাতমুখ ধুয়ে, এক কাপ কফি নিয়ে বসলো মেরি আর আনমনা হয়ে নিজের জীবনকেই ছায়াছবির ফ্লাশব্যাকের মতো দেখতে শুরু করলো আবার। মনে পরে গেলো নতুন কাজে দিন দিন উন্নতির সাথে অনিন্দ্যর পরিবর্তন, অফিস জগতে অনিন্দ্য থেকে Andy হয়ে ওঠা ,দিন কে দিন কাজ, কাজের পর অফিস কলিগদের সাথে পার্টি , নাইট ক্লাব নিয়ে ডুবে থাকা। ছোটখাটো কাজ আর আরিয়ানকে দেখভাল করেই কাটতো মারিয়ামের দৈনন্দিন জীবন। দিন কে দিন হারিয়ে যাচ্ছিল পারস্পরিক আস্থা, হচ্ছিল ছন্দপতন। Andy ডলারের মোহে নতুন নতুন ব্যবসায় টাকা লাগাতে শুরু করলো। বৈধ অবৈধ বিচার নির্বিশেষে রাতারাতি বড়োলোক হওয়ার মোহে জড়িয়ে পড়লো মোহিনী সারিনা আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের পাল্লায়।

এক মাসে ইনভেস্টমেন্ট দ্বিগুন হচ্ছিলো, জেনে ও জানতে চাইছিলনা কোন অসৎ উপায়ে এই টাকা আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে চলছিল সংসারের অবহেলা। আরিয়ানের জন্মদিন ভুলে যাওয়া, বিবাহ বার্ষিকী ভুলে যাওয়া সব ই গা সওয়া হয়ে যাচ্ছিল মারিয়ামের। ডলারের চাকচিক্যে হারিয়ে যাচ্ছিল সেই চেনা অনিন্দ্য। মারিয়ামের জীবনে, সিনেমা টেলিভিশনের গল্পই যেন ঢুকে পড়ছিলো সত্যি হয়ে। ইনভেস্টমেন্ট এর জন্য ধার করা , সেই টাকা শোধ করার জন্য আরেকজায়গায় ধার , ponzy স্কিম এ লোকজনকে প্রতারণা করা , একটু আধটু ড্রাগ, এই আবর্তে ডুবতে শুরু করেছিল অনিন্দ্য। আরিয়ান কে একাই বড় করছিলো মারিয়াম। ৬ বছর বয়সে প্রথম স্কুল এ যাওয়ায় ও অনিন্দ্যর উপস্থিতি পাইনি আরিয়ান। স্কুল বাস এ ফেরার পথে এক্সিডেন্ট এ প্রচুর রক্তপাত হওয়াতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

হয় আরিয়ান সহ আহত স্কুলের বাচ্চাদের। স্কুল থেকে খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে অনিন্দ্যকে ফোন করে ও ফোন পাইনি নেশায় মত্ত অনিন্দ্যর থেকে। হাসপাতাল জানায় আরিয়ান এর AB নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ। এই বিরল গ্রুপের রক্ত দুষ্প্রাপ্য। ইমার্জেন্সি হলে রক্ত সংগ্রহ করতে হবে। দিশেহারা অবস্থায় সব ব্লাড ব্যাঙ্ক এ যোগাযোগ করেও পাইনি এই রক্ত। ভগবানের অসীম কৃপায় এই যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিলো আরিয়ান। বাড়ি ফিরে এক মাস পর যখন আবার স্কুল এ যেতে শুরু করলো , মারিয়াম কাজ ছেড়ে নিজেই নিয়ে যেত স্কুল এ। সংসার চালাতে হাত পাততে হতো অনিন্দ্যর কাছে। জোড়া তালি দিয়ে চলছিল সংসার।

এক রাতের মেলোড্রামাটিক পরিবেশেই শেষ হয়ে গেলো নতুন দেশের পাতানো সংসার। মধ্য রাত্রে সারিনাকে নিয়ে মত্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকে বললো আজ থেকে সারিনা এখানেই থাকবে , তোমরা বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। একদিন যেমন দেশ থেকে বেঘর হয়ে এসেছিলো নতুন দেশে নতুন ঘর বসাতে আজ আবার আরিয়ান কে নিয়ে নতুন জীবন সংঘর্ষ শুরু। মারিয়াম নয়, পর দিন সকালে পুলিশ এর সাহায্যে অনিন্দ্যকেই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এর অভিযোগে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল বাড়ি থেকে। সেই শেষ দেখা অনিন্দ্য কে।

সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স , চাইল্ড বেনিফিট আর অস্থায়ী কাজ নিয়েই চালাতে হচ্ছিলো মারিয়াম আর আরিয়ানের ছোট্ট সংসার। কমিউনিটি হেলথ কেয়ার সেন্টার এ আরিয়ানের চেক আপ করতে গিয়ে আলাপ হয় সৌম্য দর্শন পিতৃপ্রতীম ডাক্তার জোসেফ নিকোলাস এর সাথে। ডাক্তার জোসেফ এর উপদেশে আর সহায়তায় হাম্বার কমিউনিটি কলেজ এ নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট এর শর্ট কোর্স থেকে শুরু করে, নার্সিং হোম এ পার্ট টাইম কাজ থেকেই তার একার জীবনে সাবলম্বী হওয়ার উড়ান শুরু।

দীর্ঘ ১৭ বছর পর মারিয়াম আজ টরন্টো সানিব্রুক হেল্থ সাইন্স সেন্টার এ ট্রমা ইউনিট এর সিনিয়র নার্স মারি। আরিয়ান ডাক্তারি স্টুডেন্ট। আরিয়ানকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া মাকে আজ হাসপাতালে পৌঁছে দেয় আরিয়ান আর ডিউটি শেষে নিতেও আসে। আসতে মানা করলেও ও শোনেনা মারির গার্জেন আরিয়ান।

চিন্তার রেশ কেটে যায় শেষরাত্রে এম্বুলেন্সএর সাইরেন আর ওয়ার্ড বয়দের ছোটাছুটি তে। EMS থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল হাইওয়ে ৪১০ এর বরফ ঢাকা রাস্তায় পিছলে একটা গাড়ী খাদে পড়ে, গুরুতর আহত চালক আর মৃত তার সঙ্গিনী। অপারেশন থিয়েটার এ তৈরী ছিল মারি আর ডিউটি সার্জেন। স্ট্রেচার যখন ঢুকলো মুখ, হাত আর দেহের উর্ধাংশ এ মাল্টিপল ফ্র্যাকচার , আর রক্তক্ষরণে মুমূর্ষু আহত চালক কে নিয়ে আর দেরি না করে সার্জেন শুরু করলো ইমার্জেন্সি অপারেশন। স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় সার্জেন কে সহায়তা করে মারি রক্তের নমুনা নিয়ে ছুটলো হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্ক এ পরীক্ষা করে রক্ত আনতে। ব্লাড ব্যাঙ্ক জানালো রেয়ার ব্লাড গ্রুপ AB নেগেটিভ নেই। সার্জেন এর মতে আর ঘন্টা চারেকের মধ্যে রক্ত না দিতে পারলে রোগী কে বাঁচানো যাবে না। সব ব্লাড ব্যাঙ্ক এ এলার্ট করে ডিউটি রুম এ ফিরে গিয়ে যখন বসলো মারি তখন ভোরের আলো ফুটেছে আর ডিউটি ও শেষ।

আরিয়ান এসেছে মাকে নিতে। বেরোনোর আগে আর একবার রোগীর অবস্থা দেখতে গেলো মারি। সার্জারির পর মুখের চেহারা অনেকটা বোঝা যাচ্ছে। একঝলক দেখে নেমে এসে আরিয়ানের গাড়িতে উঠে বসে গাড়ি স্টার্ট করার আগে আরিয়ান এর হাত চেপে ধরে বললো যা রক্ত ঋণ শোধ করে আয়। রক্ত দান করে আয় মৃত্যু পথযাত্রী রোগীটার জন্য।

কচিকাঁচাদের আসর

Youth Corner

Early high school shenanigans

"A reflection and recollection of stories during my early high school year of OSA".

The ancient, brown-bricked building towers over its surroundings. A sort of historical monument in Edmonton, often more ancient than any of its surroundings of the Whyte Avenue neighborhood. A place loved by those who work and study in it due to its irrevocable charm and the sheer amount of time spent on its grounds. However, one really annoying thing that arises, is the fact that this aged demeanor brings forth many problems not present in more modern architecture. One of the most annoying ones being wooden floors that creak really loudly ALL THE TIME. It doesn't matter if the floors were said to be "renovated" or "fixed", it just looks shinier but still sounds as if it's going to cave in any second. Trying to walk in the halls when classes are extremely awkward. You are so self-conscious of the fact that you are making a tirade of noise (that everyone in their classes can hear, mind you!) that you can't decide how-to walk-in order to minimize the noise. The floor is going to creak either way, so you are forced to do a sort of weird jog through the hallways to your destination in order to minimize contact time. This problem is emphasized in the classroom when someone happens to be late or just moving around. Imagine a regular classroom scenario where everyone is quiet and mostly paying attention to the teacher in the front of the class or daydreaming, or perhaps even sleeping after a rough night the day before. Suddenly, a sharp groan erupts from the front of the class. Everyone's eyes dart towards the noise. It seems like someone is late. In most other scenarios in the real world, someone arriving late would just walk to their rightful seats in as quiet of a manner as possible, oftentimes this would not result in much noise and all would be well. But not at OSA! Everyone becomes extremely aware of the fact that someone is late and good luck sneaking into your seat because the floor would give you away. You would feel unwieldy trying to shimmy your way to your seat in a packed class, trying not to knock people's stuff off their desk while everyone (including) the teacher would watch you. This was oafish enough for the late-comer, but also awkward for the teacher. A memorable situation arose one time when this happened and our teacher noticed how everyone's attention was fixed on this late-comer. I am sure that she wanted to ignore it due to how she emphasized this during her tirade, but she

ended up being forced to address it. Due to her eccentric nature, she ended up getting into a rant about the importance of coming on time which somehow transitioned into a conversation about how her dead dog's ashes were stored in a jar within the classroom. Needless to say, her rants were a great way to pass time, and everyone would actively search for certain triggers.

"He did what!" I exclaimed forcefully as my friend delivered the breaking news that had overtaken my school about a month into the new school year. As it turns out, someone had ended up lighting a microwave on fire which ended up getting the whole school lectured and having our microwave privilege taken away. This incident really surprised me at the time because of who this kid was. This kid is a pretty good friend of mine now, but back then, I did not really know him, other than what I had heard from others. He was extremely good at math in particular and basically a lot of students in my school knew of him (especially the math contest kids) and he was a sort of "legend" at first for our school. The "legend" status quickly transformed into "kid who blew up the microwave" status for the next three years. It is not an exaggeration because from what I heard from eye-witness reports, he put a piece of foil or something in the microwave and set it to run for 10 minutes. His reasoning? I don't know, I wanted to see what would happen!" (This is verbatim what he said when we asked him). Now everyone knows that this is a bad idea. What else would happen other than the microwave catching on fire? This situation was bad enough, but it's even funnier when someone like this kid does something like this. This event basically shifted everyone's outlook on him and we all realized that he was a clown just like the rest of us.

A very sad story (but also funny to others whenever I mention this) that happened to me was when I had to decide between full IB and partial IB in grade 10. I didn't know if I really wanted to do full IB because of all the things I had heard about it. About how it was useful as a learning experience, but how it can severely deplete your grades due to the rigor of having to juggle all the IB courses along with the Alberta curriculum. However, I wanted to give it a go so I signed up for full IB during the original registration day. As the year continued and I did more research into the issue, I became more and more unsatisfied with my decision. Every alumni

that I talked to said that the program itself would not yield many “physical” benefits of use for university admissions due to how many of the IB courses offered in Edmonton (not just at OSA) were at the “standard level” rather than the “higher level” that many of the international institutions require. The “push” that made me switch out of full IB actually happened on the last day of my final grade 10 exams. I was seriously considering switching out due to how I felt after writing my exams, but it seemed as if it would be extremely rude and selfish to attempt to switch out at the last possible second. As I waited for my train to arrive at the station, my exam mark updates happened to come out! I checked my phone, glanced at the final exam result and my overall mark, ended up calling my parents, and took the bus right back to school. As you can imagine by this dramatic response, the exams certainly did not go well. I ended up making the pivotal decision of dropping full IB! The alternative I chose was to take every subject in IB except social studies for my grade 11 year (this really reduces the total volume of the course load due to the absence of certain courses required for the complete program). However, this decision ended up with the cost of having to face a disappointed and annoyed IB counselor for ditching the program at the last possible second of school and I became part of the list of kids she would poke fun at for having “commitment” issues. However, I still do not regret the choice. I ended up finding a compromise that would still challenge me, but would not cause everything else in my life to suffer, and I am really glad now after completing high school.

Overall, the best expression to describe grade 10, was simply “meh”. It wasn’t the best time due to having to figure out what learning strategies work for me and having to deal with the difficulty level of high school compared to junior high. However, I also got to meet many new people who I would go on to become really close friends with in the following years. Most people were quite meek and weren’t comfortable enough to mess around in school, but all that would change in grades 11 and 12.

- **Devaanshu Kundu**

Autumn

Haiku made by **Nishant Das Choudhury**. Haiku is a style of poetry from Japan. Traditionally, it revolves around nature and should have 5 syllables in the first line, 7 in the second, and 5 in the last.

Red, orange, yellow
All these leaves fall from a tree
Slightly and gently

As thin as paper
As gentle as a tadpole
As calm as the rain

Wind blows heavily
Leaves fall on the ground densely
Festivals are here

Celebrations come
Autumn rings into our lives
“O Agomoni!”

Acrylic Painting By Camelia Bhattacharya

DRAWING BY AADITYA KUMAR

“Shorot - An Opulence" by Neelabh Das Choudhury

Siddharth Annadurai

Painting By: Srishti Banerjee

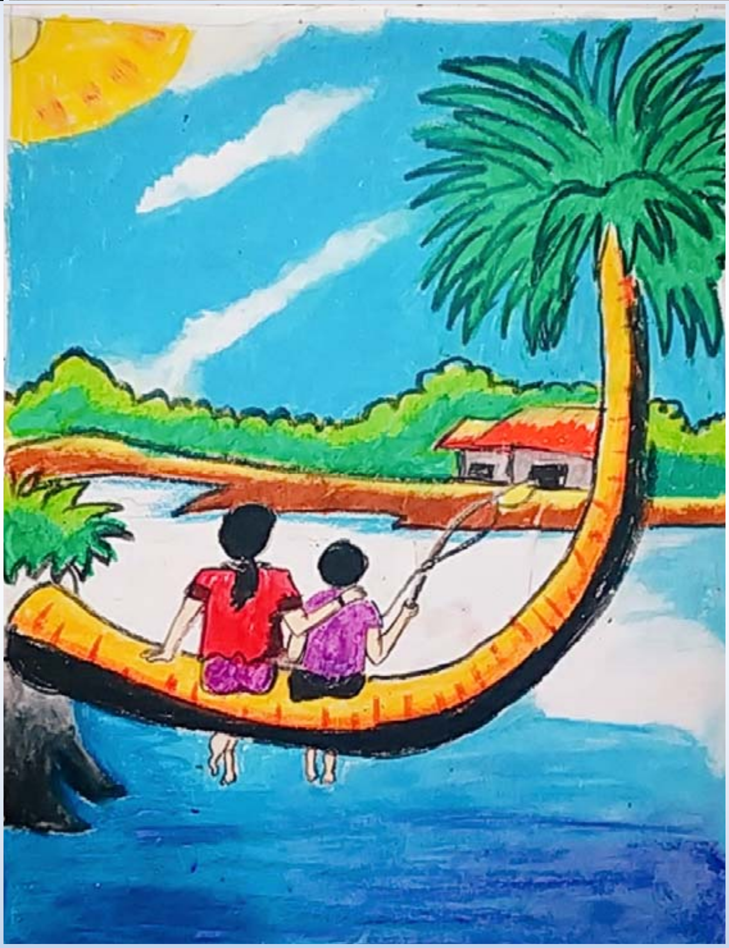

Paintings By Akashnil Majumdar (Kolkata)

Kids are the masters of the moment - they love the way it feels when they smear paint on paper. Here's presenting artworks from Akashnil -- a grade six student from Kolkata. Akashnil has an artistic bent of mind which was evident since his pre-school days. Beginning with scribbling on paper as also on walls in the early days he has traveled his way to a young budding painter who has acquired the skills of mixing and experimenting with colours. He still has a long way to go ….. Somnath Basu

EBA DONORS 2021-2022

Annadurai Bala S & Suranjana

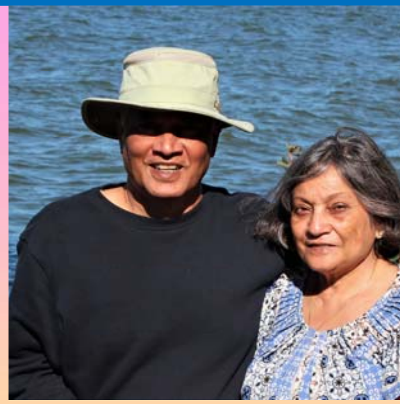

Bakshi Tuhin & Rita

Bakshi Angelina & Tejas Sankar

Banerjee Amit & Sanghamitra

Banerjee Sumit & Mitali

Trigunayat Rajeev & Sumy

Bhattacharya Sujit

Banerjee Snigdha &Poulami

Chakrabarti Amal & Sukla

Chakraborty Subroto &

Chatterjee Nilanjan & Olessia

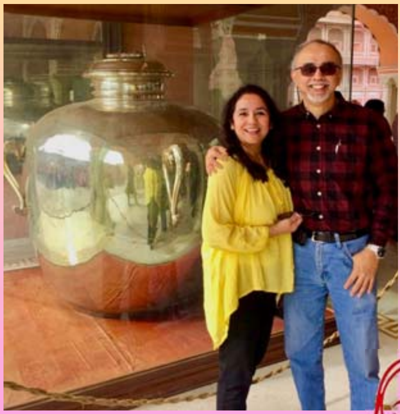

Chatterjee Tushar &Tista

EBA DONORS 2021-2022

Das Nirmal & Anima

Das Pradip & Lipika

Das Pooja & Vivek Kumar

Das Tapas & Subhra

Datta Anshuman & Ravinder

Datta Manash & Shila

Dutta Kumud & Nabanita

Datta Subrata & Aditi

Kanungo Anindita

Ghosh Shyam

Kundu Rajat & Sucheta

Lall Swapan & Rama

EBA DONORS 2021-2022

Majumdar Anup & Pali

Mandal Mrinal & Rupasri

McCormack Ryan & Sanghamitra

Mukhopadhyaya Sanjoy & Mitali

Persad Rabindranath & Sujata

Raha Syamal & Nandini

Roy Sankha & Tapasi

Roy Saktinil & Tania

Sarker Narayan & Sanchita

Sarker Shyamal & Anuradha

Shome Manas & Nandita

Vasanthan Vishnu & Epsita

EBA DONORS 2021-2022

DasChoudhury Jonmejoy & Odittee

Sen Pintu, Trina, Ryan & Titiksha

Rajput Sunjay, Sanjukta, Selina & Jayden

FIVE ANONYMOUS DONORS

CASINO VOLUNTEERING

We all know how COVID-19 has badly impacted our personal and social lives. In these difficult days, the following members spent their precious time volunteering administrative work at Star Light Casino on 19th & 20th August'21.

We all appreciate their dedication and hard work.

Mr Moloy Sen	Mr Dilip Dasmahapatra
Mr Shyamal Sarker	Mrs Anuradha Sarker
Mrs Rita Bakshi	Mr Tuhin Bakshi
Mr Jyoti Ghosh	Mr Narayan Sarker
Mr Abhijit Roy	Mrs Ricki Roy
Mr Syamal Raha	Mr Tapas Das
Mr Hijal DeSarkar	Mr Suprotim Das
Mr Sumit Banerjee	Mr Mrinal Mondal
Mr Rajat Kundu	Mrs Sucheta Kundu
Mr Manas Shome	Mrs Shati Shome
Mrs Bina Bhowmick	Mr Neelanjan Chatterjee
Mr Swapan Sarkar	Mr Moni Jena
Mr Subhadyuti Chanda	Mrs Anindita Chanda
Mr Amit Banerjee	Mr Debhasis Das
Mr Raunil Raj (Non-Member)	Mrs Neila Zelt (Non-Member)
Mr Sanjoy Mukhopadhayay	Mr Mansh Datta

এবারের (২০২১) বর্ষিক পিকনিক (বনভোজ)

প্রতিবছরের মত এবারও পিকনিক বা বনভোজের আয়োজন করা হয়েছিল "ডেভন লায়ন্স ক্যাম্প গ্রাউন্ডে"।২৪শে জুলাই শনিবার, দুপুর ১২ টা নাগাদ, আমরা প্রায় ৬২ জন জড় হয়েছিলাম ঐ পার্কের Gazebo তে। আবহাওয়া খুব মনোরম ছিল, না খুব গরম, না ঠান্ডা, না বৃষ্টি, না কঠোর রোদ্দুর। প্রকৃতিকে উপভোগ করার মত সুন্দর এক পরিবেশ।

বনভোজের ভোজন পর্ব শুরু হয়েছিল সকালের জলখাবার- ঝালমুড়ি, গরম সিঙ্গারা আর চা দিয়ে। তারপর সবাই মিলে লেগে পড়লাম দুপুরের মধ্যাহ্নভোজনের প্রস্তুতিতে। অভিজিতের তত্ত্বাবধানে রান্না করা হল মুরগীর ঝোল আর ভাত। নিরামিষাশীদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রান্না করা আর মধ্যাহ্নভোজের ফাঁকে, ছোট ছোট দল করে, সবাই পার্কে ঘুরে বেড়ালাম।

দুপুরের খাবারের পর পার্কের এক জায়গায় জড় হয়ে সবাই মিলে উদ্‌যাপন করলাম আমাদের অগ্রজ নির্মলদা আর বকুলদির ৬২ তম বিবাহ বার্ষিকী। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, ৬২ তম বিবাহ-বার্ষিকী। সত্যি ভাবলে অবাক লাগে আমাদের মধ্যে ক'জনেরই বা এরকম বর্ষিকী উদ্‌যাপন করার সৌভাগ্য হবে ভবিষ্যতে।

এর পরে মিতালীর পরিচালনায় খেলা হল "বিংগো"- সবাই খুবই এনজয় করেছিল খেলাটা। ঐ খেলা চলা কালীন, আমাদের শ্যামল রাহা আর রজত লেগে পড়েছিল চিকেন Barbeque করতে, সান্ধ্যভোজের জন্য। দুপুরের মুরাগী ভাত, তারপর তরমুজ খেয়ে পেটে আর জায়গা ছিল না কারও সান্ধ্যভোজের জন্য। তাই সান্ধ্যভোজের চিকেন আর গার্লিক ব্রেড, খাবার বাক্সে প্যাক করে দেওয়া হল সবাইকে, বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য। সবকিছু গুছিয়ে, সন্ধ্যার গোধূলি লগ্নে সবাই ফিরে এলাম যে যার বাসায়। এক সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকল ঐ দিনটা।

সেই স্মৃতির কিছু অংশ ধরে রাখা আছে এইসব ছবিতে।

মানস দত্ত

এডমণ্টন বঙ্গীয় পরিষদ

বাঙ্গালিয়ানা চাই ষোলোআনা

বনভোজন ২০২১

এডমণ্টন বঙ্গীয় পরিষদ

4141 – 98 Street NW
Edmonton, Alberta
Canada T6E 5N5

Phone: 780-433-7244
E-mail: ebaedm@gmail.com

LAKEWOOD PHYSIOTHERAPY

MOTION IS LOTION; EXCERCISE IS MEDICINE

Why Choose Us?

Whether you visit us for a one-off treatment or a longer course of action, at Lakewood Physiotherapy we make sure our patients play an active role in their recovery so they can remain pain-free once treatment ends.

ADDITIONAL SERVICES

Pelvic Floor Physio

Physiotherapy for pelvic girdle pain during pregnancy and post-pregnancy (Post-natal). Physiotherapy for diastasis recti, urinary incontinence, constipation and pelvic pain in both males and females, urinary urgency.

Having Headaches?

Talk to your Physiotherapist and see how they can help you. Physiotherapy can treat:

- TMJ Headache
- Cluster Headache
- Tension Headache
- Stress Headache

Jaw Pain

If you notice any of these symptoms talk to your physiotherapist about the same.

- Pain with Chewing Food
- Clicking
- Jaw Locking
- Jaw Popping

Car Accidents

Book an assessment with a physiotherapist to get rid of your aches and pains.

780 760 4370

www.lakewoodphysio.ca

info@lakewoodphysio.ca

Fax: 780 760 4371

Do not let your pain take control of your life!

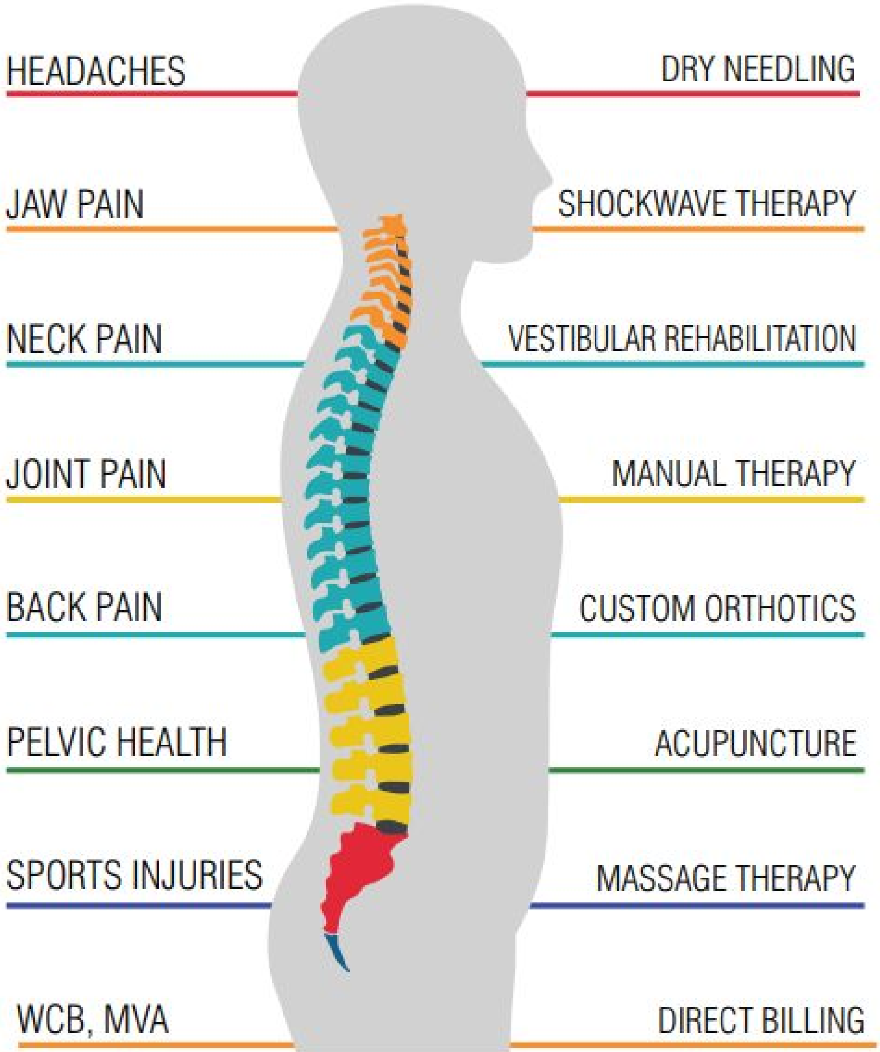

IN HOME SERVICE

CONCUSSION

Ph: 780 760 4370 Fax: 780 760 4371 #205 9129 35 Ave, Edmonton T6E 5Y1

Ab-Can Imports Ltd

SAM BHAIDANI

IMPORTERS, WHOLESALERS AND DISTRIBUTORS
OF GENERAL MERCHANDISE

4145 - 98 Street NW, Edmonton, AB, Canada T6E 5N5
Tel : (780) 665-1336 Ext: 102 Toll Free : 1-866-210-7142
Fax : +1-780-439-7458 Cell : +1-780-695-7459
www.abcanimports.com e: sam@abcanimports.com

Ab-Can Imports Limited was formed in 2003 with a main object of trading in general merchandise on a wholesale basis. The promoters of the Company had a specific long term vision of strategically growing the company business and in the span of more than five years; the company has achieved the desired growth.

Millwoods Grocery & Halal Meat Inc.

WHOLESALE/ RETAIL EAST INDIAN GROCERY, GOAT, LAMB, FISH, CHICKEN, BEEF

9232, 34 Avenue, Edmonton AB T6E 5P2

Phone: (780) 485-3504

Fax : (780) 485-3502

BUSINESS HOURS

Wednesday-Saturday 11AM-8PM

Sunday-Monday 11AM-7PM

Tuesday Closed

Contact:

Khawaja, Abdur-Rahim

PIZZA 786

Phone:

(780) 485 3510

Located Inside :Millwoods Grocery & Halal Meats

CONTACT ME
FOR PREFERRED
PRICING!
SKBANERJEE@TOYOTAONTHETRAIL.CA
587 • 708 • 9294
2 YEARS
FREE MAINTENANCE
WITH NEW VEHICLE PURCHASE
SUMIT BANERJEE
TOYOTA
TOYOTA
on the Trail
5210 CALGARY TRAIL
EDMONTON, ALBERTA
780-702-2222
TOYOTAONTHETRAIL.COM